বৃহত্তর ফরিদপুরের লোকসাহিত্য

সৈয়দা মমতাজ বেগম

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ

400412

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত
অভিসন্দর্ভ । ডিসেম্বর-২০০১

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দা মমতাজ বেগম আমার তত্ত্বাবধানে 'বৃহত্তর ফরিদপুরের লোকসাহিত্য' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা সমাপ্ত করেছেন। তিনি এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তা জমা দিবেন। এম. ফিল. গবেষক হিসেবে তাঁর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ২৭/৯৫-৯৬, যোগদানের তারিখ ০২-০৭-১৯৯৭।

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, তাঁর এই অভিসন্দর্ভ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয়নি এবং এটি অথবা এর অংশ-বিশেষ কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

ওয়াকিল আহমদ
২৪-১২-২০০১

(ওয়াকিল আহমদ)
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Library
400412

400412

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

'বৃহত্তর ফরিদপুরের লোকসাহিত্য' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, ফিল, ডিগ্রীর জন্য আমার উপস্থাপিত অভিন্দর্ভ। গ্রাম প্রধান ও কৃষি প্রধান বাংলার মানুষের অন্যতম প্রাণের সাহিত্য লোকসাহিত্য। বৈচিত্র্যের ব্যাপকতায়, বিশেষত জীবন ঘনিষ্ঠতায় লোকসাহিত্য আমাদের নিকট অত্যন্ত সমাদৃত। সুপ্রাচীন কাল থেকে লোকসাহিত্যের বৈচিত্র্যপূণ সৃষ্টি পুরাতন হয়েও আধুনিক মানুষের কাছে স্মরণীয় ও বরণীয়। লোকসাহিত্য কোন বিশেষের একক সৃষ্টি নয়, সকলের সামগ্রিক সৃষ্টি। নদীর জলের মত সবারই তাতে সম অধিকার।

লোকসাহিত্য একটি জাতির জীবনের দর্পণ। বহু পূর্বের মানুষের বংশ পরম্পরায় সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার রসমন্ডিত পরিচয়ই লোকসাহিত্যে স্থিত থাকে। লোকসাহিত্যের মাধ্যমেই আমরা চিনতে পারি, আমাদের পূর্ব পুরুষের জীবনবোধ মনন ও সংস্কৃতিকে। তাই জাতির শেকড় হিসেবে লোকসাহিত্য বিশেষ মর্যাদার আসনে অলংকৃত। তাই এ সাহিত্য যুগ যুগ ধরে ঝর্নার প্রস্রবণের মত অবাধ, নির্ঝরের মত নির্মল, বাংলার শ্যামল ক্ষেত্রের মত সুন্দর ও আকর্ষণীয়। যে সাহিত্য জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা, সংস্কৃতির দর্পণ, যা জাতির জীবন্ত ফসিল বলে বিবেচিত, সেই সাহিত্য আজ অযত্নে অহেলায় আধুনিক সভ্যতার সর্বনাশা বিক্ষুব্ধ তরঙ্গাঘাতে বিচূর্ণ ও বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বৃহত্তর ফরিদপুরের সেই বিলুপ্ত ও অবক্ষয়িত লোকসাহিত্যকে ধরে রাখার প্রয়াস নিয়েই আমি 'বৃহত্তর ফরিদপুরের লোকসাহিত্য' নামে অভিসন্দর্ভটি রচনার পরিকল্পনা করেছি।

400412

এই অভিসন্দর্ভটি আমি ৩টি অধ্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করেছি।

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'বৃহত্তর ফরিদপুরের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পরিচয়'। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের মধ্যে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার ভৌগোলিক অবস্থান, পরিবেশগত অবস্থা বর্ণনার সাথে সাথে এখানকার জনগোষ্ঠির সম্প্রদায় ভিত্তিক বিভাজন ও ধর্মানুরাগী জীবনযাত্রার দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক তরঙ্গাভিঘাত এ জেলার জনজীবনকে কতটা বিচলিত ও সংক্ষুব্ধ করেছে তার চালচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা, তাদের বৃত্তি, উৎপাদনের উপাদান-উপকরণ সব মিলিয়ে বৃহত্তর ফরিদপুরের ভৌগোলিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোচনা এ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীবিভাগ' এ অধ্যায়ে লোকসাহিত্যের সুসংবদ্ধ সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে সমাজ-সংস্কার, লোকসাহিত্য ইত্যাদির অনুষঙ্গ আলোচিত হয়েছে। লোকসাহিত্যের উদ্ভব, উৎপত্তি, প্রচার, প্রসার তার ব্যবহারিকও শিল্পময় দিক, মানবজীবনের সাথে লোকসাহিত্যের সম্পৃক্ততা আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'বৃহত্তর ফরিদপুরের লোকসাহিত্যের শাখা ভিত্তিক আলোচনা ও মূল্যায়ন'। অভিসন্দর্ভের এ অধ্যায়টি তুলনামূলকভাবে বিস্তৃত ও গভীর। এ অধ্যায়ে বৃহত্তর ফরিদপুরের লোকসাহিত্যের বিচিত্র ধারা যথা ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোককাহিনী, কিংবদন্তী, লোকসংগীত, মেয়েলী গীত প্রভৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করে তার ঐতিহ্যের অনুসন্ধান করেছি। বৃহত্তর ফরিদপুরের লোকসাহিত্যের যেসব উপকরণ ছড়িয়ে আছে দৃষ্টান্ত সহকারে সেগুলোর প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য, স্বরূপ, অন্য অঞ্চলের প্রেক্ষিতে ভিন্নতা প্রদর্শিত হয়েছে। এ অধ্যায়েই বৃহত্তর ফরিদপুরের লোকসাহিত্যের উপর বিশ্লেষণধর্মী আলোচনারও প্রয়াস পেয়েছি।

উপসংহারে বলতে চেয়েছি, বাংলার যে লোকসাহিত্য আমাদের জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক রূপরেখা নির্ণয়ক সেই লোকসাহিত্যের ধারায় বৃহত্তর ফরিদপুরের অবদান অপ্রতুল নয়, বরং সমৃদ্ধ। বৃহত্তর ফরিদপুরের লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে নিহিত আছে এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ মিলন-বিরহ, হাসি, কান্নার জীবন।

আমার এ অভিসন্দর্ভ রচনায় অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ। অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি আমার অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে গভীর কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া আমাকে অনেক বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আমার অভিসন্দর্ভের কিছু কিছু উপাত্ত সংগ্রহ করে সহযোগিতা করেছেন, 'কালকিনি সৈয়দ আবুল হোসেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বাংলা বিভাগের সিনিয়র প্রভাষক জনাব এয়াকুব আলী খান, শহীদ স্মৃতি মহা বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সিনিয়র প্রভাষক বাবু দুলাল সরকার, ডি, কে, আইডিয়াল সৈয়দ আতাহার আলী কলেজের সিনিয়র প্রভাষিকা উত্তরা অধিকারী, প্রভাষিকা সন্ধ্যা দাস, প্রভাষক রফিকুল ইসলাম ও আমার স্নেহভাজন ছাত্র রহমত-ই-মওলা। সর্বোপরি আমার এ গবেষণা কর্মে, পরিকল্পনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও পান্ডুলিপির তৈরিতে আন্তরিক সহযোগীতা করেছেন অগ্রজ বন্ধু প্রতিম প্রভাষক দেদারুল আলম । সে আমার ধন্যবাদার্হ।

Dhaka University Institutional Repository

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

প্রথম অধ্যায় ১-৬

বৃহত্তর ফরিদপুরের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পরিচয় - ১

দ্বিতীয় অধ্যায় ৭-১৫

লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণী বিভাগ - ৭

তৃতীয় অধ্যায় ১৬-৬০

বৃহত্তর ফরিদপুরের লোকসাহিত্যের শাখাভিত্তিক আলোচনা ও মূল্যায়ন - ১৬

ছড়া - ১৭

ধাঁধা - ৩০

প্রবাদ - ৩৯

লোককাহিনী - ৪৬

লোকসঙ্গীত - ৪৮

উপসংহার - ৬০

সংকলন - ৬১-১০৮

ছড়া - ৬২

ধাঁধা - ৭২

প্রবাদ - ৮৮

লোকসঙ্গীত - ১০১

গ্রন্থপঞ্জী - ১০৯- ১১০

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বৃহত্তর ফরিদপুরের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পরিচয়

বসুন্ধরার অপূর্ব লীলা নিকেতন সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা, পুষ্প-পল্লবে ভরা আমাদের এই বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মানচিত্রে প্রায় মধ্যমণিতে অবস্থিত বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা। হিমালয়ের দক্ষিণে প্রবহমান দুটি প্রধান জলধারা ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার (পদ্মার) সঙ্গমস্থলে ফরিদপুর ২৩.৩০ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০.০০ ডিগ্রী দক্ষিণ দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।[১]

বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ মহকুমা নিয়ে গঠিত ছিল। ১৯৮৩ সালে সরকারের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যে এক অধ্যাদেশ বলে মহকুমাগুলোকে জেলায় পরিণত করা হয়। ফলে বৃহত্তর ফরিদপুরের রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর মহকুমাগুলো পূর্ণাঙ্গ জেলায় পরিণত হয়। তবে এই জেলাগুলো বৃহত্তর ফরিদপুরের আত্মজা হিসেবেই বেশী পরিচিত। পুরাতন মহকুমা তথা নবাসৃষ্ট জেলাগুলোকে একযোগে বোঝানোর জন্য বর্তমানে বৃহত্তর ফরিদপুর বলা হয়।

বৃহত্তর ফরিদপুর প্রখ্যাত সাধক হযরত ফতেহ আলী (রঃ)-এর নাম অনুযায়ী ফতেহাবাদ পরগণা হিসেবে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত সাধক আজমীর শরীফের হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ)-এর একজন বিশিষ্ট অনুচর শাহ্ শেখ ফরিদ উদ্দীনের নাম অনুযায়ী বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার নামকরণ হয়।

বৃহত্তর ফরিদপুরের বিভিন্ন স্থানে সর্বপ্রথম নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা বসতি স্থাপন করেছিল। পরে আর্য ও দ্রাবিড় জাতির মিশ্রণে এক সংকর জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। মৌর্য সম্রাট অশোক (২৭৩ খ্রীঃ) ফরিদপুরের দক্ষিণ অঞ্চলে বৌদ্ধ সংঘারাম প্রতিষ্ঠা করেন, যা পদ্মা নদীর ভাঙ্গনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় ফরিদপুরের কোটালী পাড়ায় চন্দ্রবর্মা কোট নামে এক দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর শিলালিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। ফরিদপুরের রাজৈর থানার খালিয়া নগর সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল।[২]

১২০৩ সালে মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজি গৌড়ে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত করলেও সমগ্র বাংলাদেশে ক্ষমতা বিস্তার করতে বিলম্ব হয়। ১৩৩০ খ্রীস্টাব্দে মুহম্মদ বিন তুঘলক ফরিদপুর সহ সমগ্র বাংলাদেশ জয় করেন ও ফরিদপুরে একজন সুবাদার নিয়োগ করেন। সুলতান নসরত শাহ্ ১৫১৯-১৫৩২ খ্রীঃ বৃহত্তর ফরিদপুরের বোয়ালমারী থানার সাতৈরে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। নসরত শাহ্ বাংলাদেশে সতেরটি টাকশাল প্রতিষ্ঠা করেন। তার মধ্যে ফরিদপুরের ফতেহাবাদের টাকশাল ছিল অন্যতম।

Dhaka University Institutional Repository

সম্রাট আকবর যখন বাংলা জয় করেন (১৫৭৫ খ্রীঃ) তখন মুরাদ খান ফরিদপুরের ফতেহাবাদের জায়গীরদার ছিলেন। মুরাদ খানের মৃত্যুর পর মুকুন্দ রায় ষড়যন্ত্র করে রাজা হন। সুবেদার ইসলাম খাঁর সময়ে ফতেহাবাদের রাজা ছিলেন মজলিস কুতুব। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে (১৬০৬-১৬২৭) শাহজাদা শাহজাহান বাংলার সুবাদার ছিলেন, তখন তিনিই পূর্ববাংলাতে তার শাসন সংহত করেন। নবাব আলিবর্দী খাঁর (১৭৪০-৫৬) অধীনে সাবি খাঁ বৃহত্তর ফরিদপুরের কোটালীপাড়ার কতোয়াল ছিলেন।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌলা পরাজিত হলে বাংলার রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হয় । ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করার পর ফরিদপুরের উত্তর-পশ্চিম অংশ রাজশাহীর জমিদারীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে স্থায়ী বন্দোবস্তের পর গোয়ালন্দ সাব-ডিভিশন ও গোপালগঞ্জ সাব-ডিভিশনের কিছু অংশ যশোহরের সাথে সংযুক্ত হয়। ফরিদপুরের কিছু অংশ জালালপুর (ঢাকা জেলার একটি অংশ), বাকেরগঞ্জ, ফরিদপুর একত্রিত হয়ে ঢাকা জেলার সৃষ্টি হয়, যার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় । জালালপুর ফরিদপুরের একটি পরগণা।[৩]

১৮০৭ সালে ঢাকা-ফরিদপুর প্রধান কার্যালয় ঢাকা থেকে ফরিদপুরে স্থানান্তরিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বৃহত্তর ফরিদপুর ঢাকা, বরিশাল, যশোহর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮১৫ সালে একজন সহকারী কালেক্টরের অধীনে ফরিদপুর জেলাকে সম্পূর্ণরূপে একটি ভিন্ন কালেক্টরেটে রূপান্তরিত করা হয়। ১৮৫৯ সালে একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের অধীনে এনে ফরিদপুর জেলাকে একটি পূর্ণাঙ্গ জেলার মর্যাদায় উন্নীত করা হয়। ১৮৭১ সালে পাবনা জেলা থেকে পাংশা থানা এনে গোয়ালন্দ মহকুমা গঠন করা হয়। ১৮৫৪ সালে সৃষ্ট মাদারীপুর মহকুমাকে বাকেরগঞ্জ থেকে আলাদা করে ১৮৭৩ সালে ফরিদপুর জেলার সাথে সংযুক্ত করা হয়। ১৮৭৫ সালে ফরিদপুর জেলায় একজন পূর্ণাঙ্গ জেলা জজ নিয়োগ করা হয়।[৪]

হাজী শরীয়তুল্লার নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলন থেকে শুরু করে ওহাবী আন্দোলন, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ, ১৯০৫ সালের বঙ্গ ভঙ্গ, ১৯২১ সালের খিলাফত আন্দোলন, ১৯৪০-৪১ পাকিস্তান আন্দোলন, ১৯৪৬ সালের কলিকাতা দাঙ্গা, ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট, ১৯৬২ ও ৬৫ সালের নির্বাচন, ১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ আন্দোলন, ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও ১৯৭১ সালের মুক্তি যুদ্ধ প্রভৃতি রাজনৈতিক ঘটনার তরঙ্গ-সংঘাত বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার সমগ্র জনজীবনকে নানাভাবে আলোড়িত-আন্দোলিত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

© Copyright GEODESEC LTD.

Dhaka University Institutional Repository
পদ্মা-মেঘনা-গড়াই-মধুমতি-আড়িয়ালখাঁ-কুমার বিধৌত বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশের নবম জেলা । এ জেলার আয়তন ২৬৯৪ বর্গমাইল। সমগ্র বাংলাদেশের শতকরা ৪.৮০ ভাগ জায়গা এ জেলায় অবস্থিত। জেলার উত্তরে পদ্মা নদী ও পাবনা, দক্ষিণে খুলনা ও বরিশাল পূর্বে মেঘনা নদী ও ঢাকা, পশ্চিমে যশোহর ও কুষ্টিয়া জেলা। বৃহত্তর ফরিদপুরকে ভেঙ্গে বর্তমানে পাঁচটি জেলায় বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছেঃ

১। ফরিদপুর।

২। মাদারীপুর।

৩। শরীয়তপুর।

৪। গোপালগঞ্জ।

৫। রাজবাড়ী।

ফরিদপুর জেলায় মোট ৭টি থানাঃ-

১। কোতয়ালী ২। চরভদ্রাসন ৩। আলফাডাঙ্গা ৪। বোয়ালমারী ৫। সদরপুর ৬। ভাঙ্গা ৭। নগরকান্দা।

রাজবাড়ী জেলায় ৪টি থানা - ১। রাজবাড়ী, ২। বালিয়াকান্দি, ৩। পাংশা, ৪। গোয়ালন্দ।

মাদারীপুর জেলায় ৪টি থানাঃ-

১। মাদারীপুর সদর ২। কালকিনি ৩। শিবচর ৪। রাজৈর

গোপালগঞ্জ জেলায় ৫টি থানা - ১। গোপালগঞ্জ, ২। কোটালীপাড়া, ৩। টুঙ্গিপাড়া, ৪। মোকসেদপুর, ৫। কাশিয়ানী ।

শরীয়তপুর জেলায় ৬ টি থানাঃ- ১। পালং, ২। জাজিরা, ৩। নড়িয়া, ৪। ভেদরগঞ্জ, ৫। ডামুড্যা, ৬। গোসাইরহাট ।

নদীবেষ্টিত ফরিদপুর জেলা মূলত পদ্মা নদীর বদ্বীপ। এর আকৃতিও প্রায় 'ব' এর মত। জেলার উত্তরে চাপা দক্ষিণে প্রশস্ত। উত্তর ও মধ্য ভাগের প্রস্থ গড়ে ২৫ মাইল। কিন্তু দক্ষিণে গিয়ে বেড়ে হয়েছে ৫০ মাইল বঙ্গোপসাগরের তলদেশ থেকে পদ্মা ও তার বহু শাখা প্রশাখার মোহনায় এ জেলার জন্ম হয়েছিল। বর্তমানে এ জেলার ভূ-প্রকৃতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) উত্তরাঞ্চল (খ) দক্ষিণাঞ্চল (গ) দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল। উত্তরাংশের ভূমি দক্ষিণাংশের ভূমি থেকে অনেক উঁচু এবং কুষ্টিয়া যশোরের ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে এর বেশ মিল রয়েছে। দক্ষিণ-পূর্বাংশ গঠিত হয়েছে পদ্মা নদীর শাখা-প্রশাখার বিস্তারে। এ অঞ্চলে নদী, খাল ও বিলের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। ফরিদপুরের প্রধান বিল ও

Dhaka University Institutional Repository

জলাভূমির মধ্যে রয়েছে চতল, কাটলি, নলুয়া, মৌরী, ঘোড়ামারা, কাজলডাঙ্গা, বাখিলা, দিঘা ইত্যাদি। পদ্মা আর চার শাখানদীর পলল অবক্ষেপণের ফলে ফরিদপুরের সৃষ্টি হয়েছে । মূলত ফরিদপুর পদ্মার অবদানে সমৃদ্ধ।[৫]

পদ্মার প্রধান দুটি শাখা গড়াই-মধুমতি এবং আড়িয়ালখাঁ এ জেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। মধুমতি এ জেলার পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে কুষ্টিয়া, যশোহর ও খুলনা জেলার সাথে সীমান্ত রক্ষা করেছে। পদ্মা-মেঘনা-মধুমতি, আড়িয়াল খাঁ ছাড়া জেলার অন্যান্য নদী হচ্ছে চন্দনা, কুমার, ভুবনেশ্বর, শীতলক্ষা, পালং, বারাসিয়া ও টুরকী। চন্দনা এ জেলার উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে গড়াই নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সুপ্রসিদ্ধ কুমার নদী ফরিদপুরের অদূরে কানাইপুরের নিকট দিয়ে প্রবাহিত হয়ে প্রথমে উত্তর পশ্চিমে এবং পরে দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে মাদারীপুরের আড়িয়ালখাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।[৬]

ফরিদপুরের জলবায়ু সমভাবাপন্ন। এখানকার শীতকাল শুষ্ক ও আরামপ্রদ এবং গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ও আর্দ্র। গ্রীষ্মকালে এ জেলার উপর দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হলে এর আদ্রতা সর্বাধিক লক্ষ্য করা যায়। এ সময় এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ফরিদপুরের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৭৬.৪৬ ইঞ্চি। এ জেলার সর্বাধিক উষ্ণতা পরিলক্ষিত হয় এপ্রিল মাসে এবং সর্বাধিক শীত পরিলক্ষিত হয় জানুয়ারী মাসে।

জনবসতি

১৮৭২ সালের প্রথম আদমশুমারীতে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার জনসংখ্যা ছিল ১৫,৬০৩৩৭ জন এবং ১৯৫১ সালের আদমশুমারীতে এই জনসংখ্যা দাঁড়ায় ২৭,৭৪৩৪৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১৪,৩৬,৮০৮ জন এবং মহিলা ১৩,৩৭,৫৩৭; নারী-পুরুষের অনুপাত ছিল ১,০০০ পুরুষে ৯৩০ জন মহিলা। ১৯৬১ সালের আদমশুমারীতে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার জনসংখ্যা ১৮৭২ সালের জনসংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশী হয়ে দাঁড়ায় ৩১,৭৮,৯৪৫ জন। পুরুষ ১৬,২৫,৭০২ এবং মহিলা ১৫,৫৩,২৪৩ জন। ১০০০ পুরুষের বিপরীতে মহিলার সংখ্যা ছিল ৯৫৫ জন। ১৮৮১ সালে জনসংখ্যার ৬০% ছিল মুসলমান এবং প্রায় ৪০% ছিল হিন্দু।[৭]

১৯৬১ সালের আদমশুমারীতে ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর এবং গোপালগঞ্জের মিউনিসপ্যালিটি এলাকা সমূহকে শহরাঞ্চল হিসেবে দেখানো হয়। সে সময়ে জনসংখ্যার ৯৭.৫৩% বাস করত গ্রাম সমূহে এবং শহরাঞ্চলে বাস করত মাত্র ২.৪৭%।

এ জেলার অধিবাসীদের উদ্ভব ঘটেছে বিভিন্ন জাতি থেকে। বেশীর ভাগ অধিবাসীর উদ্ভব দ্রাবিড় এবং মঙ্গোল জাতি থেকে। কেউ এসেছে আর্য অথবা ইন্দো-ইউরোপীয় এবং

Dhaka University Institutional Repository

সেমিটিক জাতি থেকে। আর্য-অনার্য এবং অন্যান্য জাতির সংমিশ্রিত রূপের প্রকাশ দেখা যায় এ জেলার আধবাসীদের শারীরিক গঠন, চেহারা এবং আকৃতি প্রকৃতিতে।

মুসলমান পেশাজীবী মানুষের মধ্যে কৃষক, দর্জি, তাঁতী, জেলে, ছাতা মেরামতকারী, ঘরামী প্রভৃতির বসবাস বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় । হিন্দু পেশাজীবী মানুষের মধ্যে কামার, কুমার, কৈবর্ত, ছুতার, স্বর্ণকার, কাহার, বৈষ্ণব, বৈরাগী, শুদ্র, ধোপা, নাপিত, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি ।[৮]

অর্থনৈতিক অবস্থা

L.P. Jack তাঁর Bengal District Gazetteers. Faridpur (1925)- এ বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার ১৯০৬-১৯১০ সালের যে অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা দেন তা নিম্নরূপঃ
ফরিদপুর জেলার প্রতিটি লোকের গড় বার্ষিক আয় ৫২ টাকা, মাথাপিছু ঋণ ১১ টাকা এবং মাথাপিছু কর দিতে হয় ২.৭৫ টাকা। একটি সচ্ছল পরিবারের সদস্যদের বার্ষিক ব্যয় ৫০ টাকা এবং একটি অসচ্ছল পরিবারের সদস্যের বার্ষিক ব্যয় মাত্র ২০ টাকা।[৯]

ফরিদপুর জেলার অধিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরে P.R. Das Gupta বলেন, ১৯৪২-৪৩ সালের জেলার ২৯৯৬টি পরিবারের মধ্যে ৮৩৫টি পরিবার সচ্ছল, ৮৪২টি পরিবার অসচ্ছল, ৫১৭টি পরিবার দারিদ্র্য সীমার ওপরে এবং ৭০২ টি পরিবার দারিদ্র্য সীমার নীচে।

মাটি ও কৃষি

ফরিদপুরের মাটি অনেক উর্বর। এ উর্বর মৃত্তিকা মূলত পদ্মা ও তার শাখা নদীসমূহের পলল অবক্ষেপণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য এ জেলার অধিকাংশ স্থানেই পলল মৃত্তিকা বিদ্যমান। এ মৃত্তিকার প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক গঠন বিশ্লেষণ করে একে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ-

১। পলি মাটি।
২। দো-আঁশ মাটি।
৩। কাদা মাটি।
৪। জলাভূমি ও পিঠ মাটি।

ভূমি ও মৃত্তিকা বৈশিষ্ট্য অনুসারে ফসল বিন্যাস ১৯৬০ সালের কৃষি শুমারী অনুযায়ী বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল ১২,৬১৮৪৭ একর। এর মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

চাষাবাদ করা হয় ১০৯৪৬৪২ একর। বাকী ১,৬৭,২০৫ একর অনাবাদী ছিল। বনাঞ্চল, ১৫৫৮০ একরে কোন চাষবাস করা হয়নি এবং ১৩৪০০৬৭ একর চাষবাসের অযোগ্য ছিল।

মাঝারী উঁচু জমি- দুই ফসলী- পাট + রবিশস্য
মাঝারী উঁচু জমি- তিন ফসলী- আউশ + আমন + রবিশস্য
মাঝারী নীচু জমি- এক ফসল- বোরো- পতিত
মাঝারী নীচু জমি- তিন ফসল- আউস + আমন + রবিশস্য

রবিশস্য ঃ গম, সরিষা, আলু, ভুট্টা, যব, পিঁয়াজ, রসুন, ধান, মরিচ, মুগ, মসুরী, মাসকলাই ছোলা, মটর ও খিরা, সয়াবীন, সূর্যমুখী, তিল, কাউন, তিসি, চিনাবাদাম, মিষ্টি আলু, তরমুজ, বাঁধাকপি, ফুলকপি।

অন্যান্য ফসল ঃ বোনা আউস, পাট, রোপা আমন, ইক্ষু, কচু, ধৈঞ্চা, কলা।

সাংবাৎসরিক বন্যা ও ঘুর্ণিঝড়ের শিকার হওয়া ফরিদপুরের বিধিলিপি একটানা বৃষ্টিপাত হলেই ফরিদপুরের নীচু এলাকা জলমগ্ন হয়। বর্ষার স্ফীত পদ্মা নদীর পানি বিপদ সীমা অতিক্রম করলে দেখা দেয় বন্যা। নদী বহুল ফরিদপুরে নদীর ভাঙ্গনে চলছে প্রতি বছর পদ্মা-মেঘনা ও মধুমতির ভাঙ্গনে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়, হাজার হাজার মানুষ হয় সর্বস্বান্ত। আবার জেগে-ওঠা চর দখল নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, শক্তিমান ও শক্তিহীনের লড়াই চলছে প্রতিনিয়ত।

তথ্য নির্দেশিকা ঃ-

১. মনোয়ার হোসেন, ফরিদপুর গাইড, ১৯৯৮, পৃ. - ১৯ - ২০ ।
২. ঐ পৃ. ২১
৩. Nurul Islam Khan C.S.P. Bangladesh District Gazetteers. Faridpur. Dhaka. - P. 1
৪. Bangladesh District Gazetteers. Faridpur. Dhaka. – P. 6-7
৫. মোঃ আবু তালেব মিয়া, বৃহত্তর ফরিদপুরের লোকসাহিত্য ও খ্যাতিমানদের ইতিবৃত্ত, প্রকাশক - পল্লী বাংলা কবি সাহিত্যিক পরিষদ, ঢাকা ১৯৯৩, পৃ. - ১০
৬. ঐ, পৃ. ১২
৭. আব্দুল জব্বার মিয়া মাদারীপুর জেলা পরিচিতি, পৃ. - ২১
৮. ঐ, পৃ. ২৪-২৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীবিভাগ

লোকসাহিত্যের (Folk Literature) সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে নানা বিতর্ক রয়েছে। Folk অর্থ জনগণ বা সাধারণ মানুষ এভাবে দেখলে লোকসাহিত্য সেই সাহিত্য যা গ্রামে বসবাসকারী অশিক্ষিত কৃষক, মজুর, নাপিত, কামার, কুমার, ধোপা, জেলে, জোলা, কলু, তাঁতি, ডোম প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর নিম্নবৃত্তির, নিম্নবিত্তের এবং বিশেষভাবে পল্লীবাসীদের দ্বারা সৃজিত, লালিত এবং হস্তান্তরিত সাহিত্যকেই বুঝায়। শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর এবং শহুরে মানুষের এতে অংশগ্রহণ নেই। এ দৃষ্টিকোণকে সত্য মেনে নিলে লোকসাহিত্য অতীতের সাহিত্য হিসেবেই বিবেচিত হয়, তবে বর্তমানেও এর সৃষ্টি প্রবাহ অব্যাহত থাকে।[১]

যেহেতু লোকসাহিত্য মানুষের মুখে মুখে রচিত, প্রচলিত এবং বিবর্তিত হয়, সেহেতু তা স্বতঃপরিবর্তনশীল আর সেজন্যই চির পুরাতন হয়েও চির নতুন, চিরকালীন। গ্রামে বসবাস করলে বা অশিক্ষিত হলেই তারা 'লোক' আর শহরে বাস করলে, শিক্ষিত হলেই তাদের মধ্যে লোকত্ব থাকবে না, এমন ধারনা ঠিক নয়। লোক কথাটি বুঝতে হবে মূলত তার চরিত্র, কার্যকলাপ, চিন্তা ও মননের ভিত্তিতে, সামাজিক অবস্থান, বাসস্থান বা শিক্ষার ভিত্তিতে নয়। নিউইয়র্কের মার্জিত রুচিসম্পন্ন, উচ্চশিক্ষিত একজন ধনী ব্যবসায়ী তার মামলার দিনে একটি লাল টাই যত্ন করে পরে যায়। কেননা এই টাইটি পরে সে মামলায় জিতেছিল। এই বিশ্বাস লালন করে বলেই সে শিক্ষিত শহুরে হলেও লোক (Folk)।[২]

সেই আদিম কাল থেকে মানুষ কিছু কিছু বিশ্বাস লালন করে আসছে, সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে অনেক বিশ্বাস ও সংস্কার পরিবর্তিত ও সংস্কারপ্রাপ্ত হয়েছে। কালের যাত্রাপথে বহু অভিজ্ঞতা, বহু চেতনা, রসবোধ, আনন্দানুভূতি, সৃষ্টির প্রেরণা এগুলো মানুষের প্রাণের সম্পদ, এগুলো লোকসাহিত্যেরও সম্পদ।

সমাজ ও সংস্কৃতির রূপান্তরে লোকসাহিত্যের রূপান্তর ঘটেছে এবং ঘটবে। এরই কোন এক অবকাশে লোক ও আলোকের (enlighteness) পার্থক্য সূচিত হয়। তবে লোক-আলোকের পার্থক্য স্থানগত বা সামাজিক অবস্থানগত নয়, সংস্কৃতির মানগত বা শিক্ষাগত তো নয়ই, পার্থক্য ব্যক্তি ও দলের আচরণগত ও চরিত্রগত।

লোক তারাই যারা সুদূর অতীত থেকে লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি সৃষ্টি করে আসছে এবং এখনো সৃষ্টি করে চলেছে, তারা গ্রামের এবং শহরের, তারা শিক্ষিত এবং

Dhaka University Institutional Repository
অশিক্ষিত, তারা ধনী এবং দরিদ্র এবং গ্রাম্যতা বলতে যা বুঝায় তা থেকেও তাদের রুচিবোধ মুক্ত নয়। একমাত্র স্বচ্ছল আর্থিক বুনিয়াদই সাংস্কৃতিক চেতনাকে সমৃদ্ধ করে না। লোক নির্ধারণে তাই চরিত্র নির্বাচনে মেজাজ ও বিশ্বাস বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কেবল একটি দেশে নয়, সমাজে নয়, দলে নয় ও সংস্কৃতিতে নয়, একটি ব্যক্তিতেও লোকের লোকত্ব মিশে আছে। গ্রাম্য হলেই কেবল লোক স্তরের হয় না, তেমনি শহুরে মাত্রেই আলোকপ্রান্ত নয়। লোকস্তর কেবল গ্রামেই নয় নগরেও এর অস্তিত্ব আছে।

লোকসাহিত্য কি তা বলতে গেলে ফোকলোর (Folklore) সম্পর্কে ধারনা থাকা প্রয়োজন। কারণ লোকসাহিত্য ফোকলোরের বিশেষ একটা দিক। ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের উইলিয়াম থমস্ "দি এ্যাথেনিয়াম" পত্রিকায় প্রথমে Folklore শব্দটি ব্যবহার করেন। বলা হয়- পুরুষানুক্রমে প্রচলিত মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে এর উৎপত্তি ও স্থিতি। সে সূত্র ধরে অশিক্ষিত সমাজে স্বাভাবিক ভাবে পুরুষানুক্রমে মৌখিক ভিত্তিতে প্রচলিত সমস্ত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য এমনকি শিকারের রীতিনীতি, বিয়ের নিয়মকানুন, ন্যায় অন্যায় বোধ পর্যন্ত যা মুখে মুখে প্রচলিত, তাকেও ফোকলোরের আওতায় ফেলতে হয়। তদুপরি হাতে কলমে শিক্ষার বিবিধ বিষয়েও ফোকলোরের সীমানায় টেনে আনতে হয়। সেক্ষেত্রে ইঞ্জিন চালানো থেকে দাঁত ব্রাশ পর্যন্ত এর অধীনে চলে আসে। কিন্তু মূলত এগুলো সংস্কৃতির অংগ, ফোকলোর নয়। তাহলে বলা যায়, একটি জনসমাজে মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে যা কিছু বিস্তার লাভ করে তার সবকিছুই ফোকলোর নয়।[৩]

ফোকলোর কেবল ঐতিহ্যগতভাবে মুখে মুখে প্রচার, তাও নয়। কিছু ফোকলোরের জন্মই লিখন পদ্ধতির মাধ্যমে। যেমন শিকলিপত্র, একজনকে স্বপ্নে পাওয়া কোন বিষয় বা নির্দেশ লিখে জানিয়ে দেওয়া হলো এবং বলা হলো সে এমনিভাবে লিখিত আকারে আরও দশজনকে জানাবে, নইলে তার উপর ঈশ্বর প্রাপ্ত চরম শাস্তি নেমে আসবে।

আবার কিছু কিছু বিষয় অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বংশ পরম্পরায় প্রচারিত হয়। সেগুলো কখনো মৌখিক ঐতিহ্যের আশ্রয়ে গড়ে ওঠেনা। যেমন-লোকনৃত্য, লোকখেলা, লোকভঙ্গি ইত্যাদি। এগুলো মুখে শুনে আয়ত্ত হয় না, এগুলো দেখে দেখে শিখতে হয়। লোকচিত্রকলা আলপনা, লোকভাস্কর্য ইত্যাদি, এগুলো যেমন মৌখিক ঐতিহ্য নির্ভর নয়, তেমনি দৃষ্টিলব্ধ ঐতিহ্য সম্পন্ন নয়, অথচ এগুলো ফোকলোর।

Dhaka University Institutional Repository

তাহলে বলা যায় যে, ফোকলোর পূর্ব পুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষে এবং ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির মুখে মুখে প্রচলিত হয় অথবা কার্যের ধারা বিস্তার লাভ করে কিংবা দেখে অনুসরণের মাধ্যমে তাকে আয়ত্ত করা হয়।

ফোকলোর আসলে সৃষ্টিমূলক লোকজ্ঞান যে জ্ঞান অশিক্ষিত মানুষকে মৌখিকভাবে বা ভঙ্গিগত দিক থেকে বা বস্তুগত দিক থেকে সৃষ্টির পথে উদ্বুদ্ধ করে। ফোকলোর অশিক্ষিত জনগণের সৃষ্টি। এ সৃষ্টি কখনো মৌখিক শিল্পে বা সাহিত্যে কখনো বা শিল্পগুণান্বিত বস্তু আকারে, কখনো বা শিল্পময় দৈহিক ভঙ্গিতে বা আচার ব্যবহার ও রীতিনীতিতে রূপলাভ করে। অশিক্ষিত মানুষ যুগে যুগে বংশ পরম্পরায় মুখে মুখে এই সৃষ্টির প্রবাহকে ধারন ও লালন করে চলেছে এবং তার সাথে নব নব সৃষ্টিতে এই ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। এই সৃষ্টি যেমন মুখে মুখে জন্মলাভ করে মুখে মুখেই প্রবাহিত হয়ে চলেছে তেমনি বাস্তব ক্ষেত্রে বা ভঙ্গির ক্ষেত্রে বা রীতিনীতের ক্ষেত্রে পূর্ব পুরুষের নিকট হতে পরবর্তী পুরুষে দেখে দেখে অনুকরণের ও অনুসরণের মাধ্যমে অব্যাহতভাবে লালিত হচ্ছে এবং জীবিত রয়েছে। সুতরাং ফোকলোর একটি বৃহত্তর লোক জগত; লোকসাহিত্য তারই একটি অংশ। ফোকলোর হচ্ছে মানবগোষ্ঠীর মৌলিক সংস্কৃতি, লোকসাহিত্য তারই একটি ধারা মাত্র।

লোকসাহিত্য মূলত বাককেন্দ্রিক ফোকলোর। ফোকলোরের যে উপকরণগুলো মুখে মুখে সৃষ্টি লাভ করে মুখে মুখেই জীবিত রয়েছে সেগুলোই লোকসাহিত্য। জনৈক পাশ্চাত্য সমালোচক প্রদত্ত লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা হচ্ছে Folk is simply literature transmitted orally. এ সংজ্ঞা লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও পরিসর জ্ঞাপন করে। ফলে লোককাহিনী, লোকগীতিকা, ছড়া, লোকসংগীত, প্রবাদ-প্রবচন, হেঁয়ালি, লোকবিশ্বাস, লোক-বক্তৃতা, লোকনাম প্রভৃতি লোকসাহিত্যের এক একটি নিদর্শন।[৪]

লোকসাহিত্যের জন্ম যেমন লোকের মুখে মুখে পূর্ববর্তী সমাজ থেকে পরবর্তী সমাজে, এক দেশ বা সমাজ থেকে অন্য দেশ বা সমাজে তার প্রচারও তেমনি মুখে মুখে হয়ে থাকে। তবে মানব সভ্যতার ক্রম অগ্রগতিতে লিখন পদ্ধতি আবিষ্কারের পর লোকসাহিত্যের কিছু কিছু অংশ লিখিত সাহিত্যে প্রবেশ করেছে। পক্ষান্তরে লিখিত সাহিত্যের কোন কোন অংশ কখনো কখনো দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে মৌখিক ঐতিহ্যে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে লোকসাহিত্যের বিষয় হয়ে পড়ে।

লোকনৃত্য, লোকভঙ্গি ইত্যাদির সৃষ্টি মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে নয়। তবে বংশ-পরম্পরায় এগুলো যেমন দেখে দেখে অনুকরণের মাধ্যমে প্রচার লাভ করেছে, তেমনি কোন কোন সময় মুখে মুখে শুনেও প্রচার লাভ করে থাকে। তাছাড়া লোকাচার, লোক-উৎসব, লোক-পূজা, লোক-পার্বণ এগুলো অনুকরণ পদ্ধতির

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে বংশ পরম্পরায় প্রচার লাভ করে। তবে এর একটি বিরাট অংশ প্রচার লাভ করে মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে; লোকেরা বংশ-পরম্পরায় শুনে শুনে তা পালন করতে শেখে। তদুপরি বিভিন্ন ধরনের গ্রাম্য খেলাধূলায় অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষ শুধু যে আনন্দ লাভ করে, তা নয়। খেলাধূলার মাধ্যমে তারা বহু রকমের লোকসাহিত্যের সৃষ্টি করে । যেমন হাডুডু, গোল্লাছুট, কানামাছি, বুদ্ধির ঢেঁকি ইত্যাদি খেলার সময় বহু রকমের লোকসাহিত্যের সৃষ্টি হয়। যেমন- হাডুডু খেলার 'দম' দিতে গিয়ে বলে-

আমার খেউড় মারলি
কোথায় লিয়া গাড়লি
শিয়াল শকুনে খায়
গন্ধে রাজার পরান যায়।[৪]

কানামাছি : কানামাছি ভোঁ ভোঁ
কোথায় আমি
পারলে ছোঁ।

বুদ্ধির ঢেঁকি : আয়রে আমার সোনার টুক
কপালে দে আস্তে টুক।

বস্তুকেন্দ্রিক ফোকলোর যেমন ঘর-বাড়ি, বেড়া, আসবাবপত্র যন্ত্রপাতির ইত্যাদির মধ্যে যখন এমন কোন শিল্পকর্ম থাকে যাতে বিশেষ আবেদন অনুভব করা যায়। এই আবেদনটুকু শিল্প পর্যায়ের। কেননা তা আমাদের বস্তুর অতীত একটা সৌন্দর্যের জগতে নিয়ে যায়। যেমন- মাটির পাত্রের গায়ে আঁকা ছবি, নক্সী কাঁথা, সিকা, নকসা করা কোন কিছু ইত্যাদি। এগুলো লোকশিল্পের অন্তর্ভুক্ত। প্রচলিত ঐতিহ্য ছাড়াও সৃষ্টি লাভ করে নতুন ঐতিহ্য। লোকসাহিত্যের কোন কোন উপাদান একটি দলে সৃজিত ও স্থিতিশীল হতে পারে। কবিগানগুলো আসরে দাঁড়িয়ে লোককবিরা সৃষ্টি করেন। তাই লোকসাহিত্য প্রাচীন কালের একথা যেমন সত্য লোকসাহিত্য আধুনিক কালের একথাও সমভাবে সত্য । লোকসাহিত্যের অধিকাংশ উপাদানের স্রষ্টা ব্যক্তি অর্থাৎ একজন, তবে সেই একজনের সম্পদ সমগ্র জাতির সম্পদে পরিণত হলে তবেই তা হয়ে ওঠে লোকসাহিত্য। সমগ্র জাতির অভিজ্ঞতা, নান্দনিক চেতনা ও রসানুভূতি লোকসাহিত্যে ধরা পড়ে।[৫]

লোকসাহিত্যে হৃদয়বৃত্তির প্রাধান্য প্রণিধানযোগ্য। স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিশক্তি লোকসাহিত্যের প্রধান উৎস। দীর্ঘকালের অর্জিত জ্ঞান তার আশ্রয়। লোকরঞ্জনের ক্ষমতা তার সম্বল। লোকসাহিত্য সাহিত্য হিসেবে নিতান্তই অনাড়ম্বর। সাহিত্যের অঙ্গ-প্রকরণের

Dhaka University Institutional Repository
সূক্ষ্মতা লোকসাহিত্যে নেই। লোকসাহিত্য যা বলতে চায়, তা রেখে ঢেকে বলে না। সবই বলে দেয়। স্বভাব কবিত্ব ও স্বভাবধর্ম লোকসাহিত্যের প্রাণ। লোসাহিত্যের ভাষা লোকেদের নিত্য ব্যবহার্য ভাষার ওপরে একান্তভাবে নির্ভরশীল। সাধারণের বোধগম্যতাই তার আসল লক্ষ্য। লোকের পোষাক আটপৌরে, ভাষাও তেমনি সাদামাটা। লোকসাহিত্যে কৃত্রিমতার কোন অবকাশ নেই। লোকসাহিত্য চরিত্রে ও মেজাজে অপর অপর সাহিত্য থেকে স্বতন্ত্র।

লোকসাহিত্য মুখে মুখে স্থিতিশীল হলেও তার ভ্রমণ-ক্ষমতা বিস্ময়কর, ভারতবর্ষের বহুকাহিনী ইউরোপে ভ্রমণ করেছে, চলে গেছে আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে আমেরিকায়। লোকসাহিত্যে যে বিশ্বজনীনতা আছে তা সাহিত্যের চেয়েও উজ্জ্বল। "চকচক করলেই সোনা নয়, তেলে মাথায় তেল দেওয়া," "নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা " প্রভৃতি প্রবাদ ভারতীয় উপমহাদেশের ভাষাগুলোতে যেমন আছে তেমনি আছে ইউরোপ আমেরিকায়।[৬]

লোকসাহিত্য আবহমান কাল ধরে লোকায়ত সমাজের নিরক্ষর কিন্তু সৃষ্টিশীল প্রতিভা সম্পন্ন মানুষের মুখে মুখে বংশ পরম্পরাক্রমে স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদে রচিত ও প্রচলিত হয়ে আসছে।

লোকসাহিত্য লোকসমাজের সাধারণ সম্পদ। সমাজ সংগঠনের মধ্য দিয়ে মানুষ কালে কালে তাদের জীবনযাপনের স্রোতের বাঁকে বাঁকে মোহনায় মোহনায় সৃষ্টি হয়ে চলেছে লোকসাহিত্য এবং তা সমগ্র জনগোষ্ঠীর সাধারণসম্পদ হয়ে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয়েছে বিবর্তনের অনিবার্য সূত্র ধরে। এ জন্যই লোকসাহিত্যের বুকে পরিবর্তনের স্বাক্ষর বিদ্যমান। নিয়মের বন্ধন তার নেই, পরিবেশের অনুশাসন আর গভীর সীমাবদ্ধতা তাকে কোণঠাসা করতে পারে না। তার গতি স্বচ্ছন্দ, মুক্ত ও উদার। ভৌগোলিক সীমানা সে মানে না, কালের সংকীর্ণতা সে জানে না। অতীত বর্তমান তার বুকে সমানভাবে প্রতিবিম্বিত। লোকসাহিত্য পরিবর্তনশীল বলেই এর কৃত্রিমতা নেই, নিশ্চিন্ত একনিষ্ঠতা নেই, অনবরত পুনর্নির্মাণ এবং অনিবার্য লোকমানস নির্ভর আনন্দের প্রসারে যুগে যুগে এর নতুন বিকাশ ঘটেছে। কোন সুদূর অতীতে লোকসাহিত্যের প্রথম উদ্ভব, তারপর কালের বিবর্তনের, পরিবর্তনের অনিবার্য নিয়মে তা নতুন পত্র-পল্লব ফুল-ফলের জন্মদান করে চলে নতুন আলোয়, নতুন হাওয়ায়; তাইতো বলা যায় লোকসাহিত্যের চিরত্বের পেছনের এই পরিবর্তনশীলতাই ক্রিয়াশীল এবং তাই লোকসাহিত্যকে স্থবিরতার অভিশাপ থেকে রক্ষা করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

লোকসাহিত্য লোকসমাজের অধিবাসীদের জীবন ভাষ্য। আবহমান কাল পল্লীর মানুষের মনের জমানো অনুভূতি, ব্যথা-বেদনা, হাসি-কান্না অপরিসীম মমতায় পরম সতর্কতার সাথে জীবন্ত করে রেখে দিয়েছে তার Living fossil- এর বুকে। লোকসাহিত্য লোকসমাজের মানুষের চিন্তা ও আবেগানুভূতির জীবন্ত মনুমেন্ট : The joys and sorrows, the smiles and tears of every day life of the common man have gone into their making.[৭]

লোকসাহিত্য লোকসমাজজীবনের দর্পণ । সেই সাথে তা জাতীয় জীবনের দর্পণও বলা যায়। লোকসমাজের বুনিয়াদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে উচ্চতর সমাজের সুরম্য প্রাসাদ। সুতরাং লোকসমাজ উদ্ভূত যে লোকসাহিত্য তাকে সহজেই আমরা উচ্চতর সাহিত্যের ভিত্তিদল বলতে পারি। সমগ্র জাতিকে, জাতির সাহিত্য-সংস্কৃতি তথা সামগ্রিক প্রাণসত্তা সম্বন্ধে অবহিত হতে হলে লোকসাহিত্যের আলোচনা, বিশ্লেষণ অপরিহার্য। লোকসাহিত্যের ছড়া, ধাঁধাঁ, প্রবাদ-প্রবচন, লোককাহিনী, সংগীত প্রভৃতির মধ্যে নৃতাত্ত্বিক ও জাতিতাত্ত্বিক অনেক মূল্যবান উপাদান লুকিয়ে থাকে যেগুলো অতীতকে সামনে উদঘাটিত করে দেয়।[৮]

লোকসাহিত্য আদিম মানুষের শিশুসুলভ মনোভূমির ওপর গড়ে উঠেছে। মানুষের অন্তর রাজ্যের এ শিশু সুলভ সরল বিশ্বাস বস্তুতান্ত্রিকতার স্টিমরোলারে পিষ্ট হয়েও একেবারে বিলীন হয়ে যায়নি। সে জন্যেই আদিম কালের চির শৈশব, চির বসন্তের অনাবিল সৌন্দর্যের নিকেতনে ফিরে যাবার জন্যে আজকের চন্দ্রালোক অভিযানের ফাঁকে ফাঁকেও মানুষের মনকে উতালা করে তোলে। অরণ্যের সবুজকে উদগ্রভাবে অনুভব করতে, বনের পাখির সাথে মিতালী পাতাতে আজকের যান্ত্রিক যুগেও মানুষের মন সমভাবে আগ্রহ পোষণ করে। মনে হয়, ঐ অরণ্য সরলতা মানুষের সহজাত এবং চিরন্তন প্রবণতা, বিজ্ঞান সমৃদ্ধ সভ্যতার শীর্ষদেশে আরোহণ করেও মানুষ সে নিরাবরণ ও নিরাভরণ জীবনের জন্য মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের লোকসাহিত্যও আমাদের গর্বের বস্তু। নাগরিক সাহিত্যের 'বালাখানা'র পাশে লোকসাহিত্যের 'বাংলা ঘর' তুলবার জন্য তোড়জোর চলছে।[৯]

যুগে যুগে দেশে দেশে লোকসাহিত্য মানব সমাজের ভাষাগত, বংশগত এবং সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থাগত যে ইতিহাস গড়ে উঠেছে, পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশের লোকসাহিত্যের মত বাংলাদেশের লোকসাহিত্যও সেই আদি অতীতের একটা দর্পণ।

Dhaka University Institutional Repository

যে কোন সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট অংশ লোকসাহিত্য। বৈচিত্র্যে, ব্যাপকতায় এবং জীবনের সংগে একাত্মতায় উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে তা সমাদৃত। সুপ্রাচীনকাল থেকে লোকসাহিত্যের বৈচিত্রাপূর্ণ সৃষ্টি লোকমুখে প্রচলিত হয়ে আসছে এবং পুরাতন সৃষ্টি হয়েও আধুনিক মানবসমাজে সমাদৃত হচ্ছে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত ও লোকসাহিত্যের নিদর্শনগুলো মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে থাকলেও বর্তমানে এদের অনেকগুলো সংগৃহীত হয়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বিভিন্ন উদ্যোগী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সে সবের সংগ্রহ কাজ চলছে। এ ধরনের সংগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে লোকসাহিত্য বাংলা সাহিত্যের অংগনে মর্যাদাপূর্ণ আসন লাভে সক্ষম হয়েছে।

লোকসাহিত্যের নাম ও সংজ্ঞা সম্পর্কে পন্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান। তবে সর্বজন স্বীকৃত যে, লোকসাহিত্য জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত গাথা, কাহিনী, গান, ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদিকে বোঝানো হয়। সাধারণত কোন সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর অলিখিত সাহিত্যই লোকসাহিত্য। অর্থাৎ জাতীয় সংস্কৃতির যে সকল সাহিত্যগুণসম্পন্ন সৃষ্টি প্রধানত মৌখিক ধারা অনুসরণ করে অগ্রসর হয় তাকে লোকসাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সাহিত্য সৃষ্টির যে প্রবণতা চিরন্তনভাবে মানব মনে বিদ্যমান থাকে তা-ই লোকসাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। স্মৃতি-নির্ভর ছিল বলেই লোকসাহিত্য কাল পরম্পরায় পরিবর্তিত হয়ে যেত এবং কাল ও অঞ্চল ভেদে তার রূপের ও বিভিন্নতা লক্ষ্যযোগ্য ছিল।[১০]

লোকসাহিত্য সাধারণত কোন ব্যক্তি বিশেষের একক সৃষ্টি নয়, তা সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি। সংহত সমাজ বলতে সে সমাজকে বোঝায় যার অন্তর্ভুক্ত মানবগোষ্ঠী পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভেতর দিয়ে চিরাচরিত প্রথার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে চলে। লোকসাহিত্য সমাজের বিচিত্র সাংস্কৃতিক উপকরণে সমৃদ্ধ হয়ে সাহিত্য সৃষ্টির সহায়ক হয়। সমষ্টির সৃষ্টি বলে লোকসাহিত্য কোন ব্যক্তি বিশেষের নামের সাথে জড়িত থাকে না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের বিক্ষিপ্ত রচনা কালক্রমে একত্রিত হয়ে একটা সাহিত্যরূপ পরিগ্রহ করে। সমাজবদ্ধ জীবনে মানুষের ব্যক্তি পরিচয় বড় হয়ে ওঠে না বলে লোকসাহিত্য রচয়িতা হিসেবে কোন বিশেষ কবি বা গীতিরচয়িতাকে বিবেচনা না করে সমাজকেই রচয়িতা মনে করতে হয়। প্রথমত তা ব্যক্তি বিশেষের সৃষ্টি হয়ে থাকলেও জনগণের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে তা নতুন রূপ পরিগ্রহ করে এবং পরিণামে সামগ্রিক সৃষ্টি হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে।

লোকসাহিতোর বিষয়বস্তু সমাজের পরিবেশ থেকে গৃহীত হয়। জনশ্রুতিমূলক বিষয় এর উপাদান। বহুদিন পূর্বের কোন ঘটনা বা কাহিনী লোক পরম্পরায় কল্পনা

Dhaka University Institutional Repository

রূপক মিশ্রিত হয়ে লোকসাহিত্যে স্থান পায়। চিরন্তন বিষয়বস্তু এ সাহিত্যের উপজীব্য হয় বলে লোকসাহিত্যেও এর নিদর্শন বিদ্যমান। বহুকাল পূর্বের মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার রসমন্ডিত পরিচয় লোকসাহিত্যে বিধৃত। অতীতের ইতিহাস ও সমাজচিত্র এই সাহিত্যে রূপায়িত হয়ে ওঠে।

লোকসাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ ব্যাপক ও বিস্তৃত। ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, লোক-কাহিনী, লোক সংগীত প্রভৃতি প্রধান। এগুলোর আবার বিভিন্ন শাখা রয়েছে। ছড়া বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ শিশু বিষয়ক ছড়া, খেলার ছড়া, বৃষ্টির ছড়া, ঐতিহাসিক ছড়া, আচার-অনুষ্ঠান মূলক ছড়া, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক ছড়া।

ধাঁধা- মানুষ ও অঙ্গ-প্রতঙ্গ সম্পর্কিত, প্রাণী সম্পর্কিত, উদ্ভিদ ও ফলমূল সম্পর্কিত, খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কিত, নিসর্গ ও প্রকৃতি সম্পর্কিত, গৃহস্থালীর তৈজসপত্র ও যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত।

প্রবাদ- ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক, ঈশ্বর ও দেবদেবী সম্পর্কিত প্রবাদ, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যগত প্রবাদ।

লোক কাহিনী- পৌরাণিক কাহিনী, পরী কাহিনী, নীতিবাচক কাহিনী, পশু-পক্ষী কাহিনী, কৌতুক বা ব্যঙ্গাত্মক কাহিনী, ভৌতিক কাহিনী, লোকগল্প।

লোক সংগীত- জারী, সারী, ভাটিয়ালী, মারফতী, মুর্শিদী, বাউল, গম্ভীরা, আলকাপ, ঘাটু, ধুয়া, পটুয়া, বিচার, পালা, কবিগান, কীর্তন, গীত, গাজীর গান উল্লেখযোগ্য।

আধুনিককালে মুখে মুখে প্রচলিত লোকসাহিত্য লিখে রাখার চেষ্টা চলছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লোকসাহিত্যকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তা সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং সেসব লিখে রাখার ব্যবস্থাও গৃহীত হচ্ছে। এ উদ্যোগের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির লোকসাহিত্য বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং সাহিত্যরস লোকসাহিত্য রসিকদের মধ্যে পরিবেশিত হচ্ছে। বর্তমান লোকসাহিত্যকে জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির অংগরূপে বিবেচনা করে এর বহুমুখী চর্চা চলছে। তাই বর্তমানে লোকসাহিত্য আর অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত গ্রাম্য মানুষের অমার্জিত সাহিত্য সৃষ্টি নয়। বিশ্বের জ্ঞানীগুণী রসিকদের কাছে তা অকৃত্রিম সাহিত্য হিসেবে সমাদৃত।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আলোচনার নির্যাস হতে লোকসাহিত্য সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ যে ধারনা বের হয়ে আসে তা হচ্ছে, লোকসাহিত্য লোকমুখে উদ্ভূত, লোকমুখে প্রচারিত। মানব সহজাত প্রবৃত্তি হতে উৎসারিত, হৃদয়বৃত্তিতে জাগরিত, সহজবোধ্য ভাষায় অনাড়ম্বর অক্ষরে লালিত প্রকৃত সাহিত্যই লোকসাহিত্য। এ লোকসাহিত্য যেমন মানুষের প্রাণের সাহিত্য, তেমনি জাতীয় সংস্কৃতির সোনালী দলিল।

তথ্য নির্দেশিকা ঃ

১. মজহারুল ইসলাম, ফোকলোর পরিচিতি ও লোকসাহিত্যের পঠন ও পাঠন, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা বাংলা একাডেমী ১৯৯৩ পৃ. - ৩

২. ঐ, পৃ. ১৪

৩. ঐ, পৃ. ১৭

৪. ঐ, পৃ. ১৮

৫. ঐ, পৃ. ২১

৬. আশরাফ সিদ্দিকী, লোকসাহিত্য, ঢাকা স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৩, পৃ. - ৩৩ ।

৭. খালেদ মাসুকে রসুল, নোয়াখালীর লোকসাহিত্যে লোকজীবনের পরিচয়, বাংলা একাডেমী ১৯৯২, পৃ. - ৩৩

৮. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬২ পৃ. - ৪৪৩ ।

৯. আশরাফ সিদ্দিকী, লোকসাহিত্য, ঢাকা স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৩, পৃ. - ১৮৭

১০. Mazharul Islam, The Theoritical study of Folklore, 1998, Bangla Academy, Dhaka, P. 7.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বৃহত্তর ফরিদপুরের লোকসাহিত্যের শাখাভিত্তিক আলোচনা ও মূল্যায়ন

লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি ছাড়া কোন জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপরেখা নির্ণয় করা যায় না। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সজাগ উচ্চারণ লোক সংস্কৃতির মধ্যেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোন জাতি কতটা প্রাচীন ও অগ্রসর তা ঐ জাতির লোকসাহিত্য ও সাংস্কৃতিক গবেষণায় ধরা পড়বে।

বাংলা লোকসাহিত্য আবহমান বাংলার সাধারণ মানুষের সৃষ্টি। এতে রয়েছে বাঙালীর বহু যুগের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি। বাংলা লোকসাহিত্য বিশ্বের অন্যান্য দেশের লোকসাহিত্যের মতই বিকাশ লাভ করেছে এবং গবেষকগণ এর সংগ্রহ, সম্পাদনা ও গবেষণায় উৎসাহী হচ্ছেন।

পদ্মা, আড়িয়াল খাঁ, মধুমতি, ভুবনেশ্বর, কুমার বিধৌত বৃহত্তর ফরিদপুরের বিভিন্ন জেলায় লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান ছড়িয়ে আছে। লোকমুখে প্রচলিত ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোককাহিনী, লোকসংগীতের বিচিত্র শাখা জারী, সারী, বাউল, মরমী, গাজীগান, বিচার গান, মেয়েলী গীত ও কবিগানে বৃহত্তর ফরিদপুরের বিভিন্ন অঞ্চল অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

সংগ্রহ ও চর্চার অভাবে ফরিদপুরের লোকসংস্কৃতি ও লোক-ঐতিহ্যের এসব মূল্যবান উপাদান আজ বিলুপ্তির পথে। বস্তুনিষ্ঠ সংগ্রহ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের গবেষণায় ফরিদপুর জেলাও তার আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। বৃহত্তর ফরিদপুরের লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখা তার ভাষাগত, ধ্বনিগত ও কাহিনীগত বিষয় বৈচিত্র্যে নিজস্ব আঞ্চলিকতার সহজ, সরল প্রাণময়ী গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ মালায় ফরিদপুরের আবহমান স্রোতধারার শাশ্বত রূপ পরিলক্ষিত হয়। এ জেলার লোকসাহিত্যে নিজস্ব প্রাণের ঐশ্বর্যকে ভিন্নতর আঞ্চলিক পরিচয় দান করেছে।

ফরিদপুরের লোকসাহিত্যের সংগ্রাহক ও গবেষকদের মধ্যে জসীমুদ্দীন, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, আশরাফ সিদ্দিকী, আ, ন, ম, আব্দুস সোবহান, মাসুদ রেজা, শেখ শামসুল হক ও নূরুল হুদা উল্লেখযোগ্য। সাধারণভাবে লোকসাহিত্যের যেসব বিভাগ আছে, বৃহত্তর ফরিদপুরের লোকসাহিত্যেও সেসব বিভাগ রয়েছে । লোকসাহিত্যের প্রধান বিভাগগুলি হলো ছড়া, ধাঁধাঁ, প্রবাদ, লোকসঙ্গীত, মন্ত্র, লোককাহিনী প্রভৃতি । বৃহত্তর ফরিদপুরে প্রচলিত এসব প্রধান ধারার উপর আলোকপাত করে আলোচনা করা হলো ।

Dhaka University Institutional Repository

সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য ঃ 'ছট' শব্দ থেকে ছড়া শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা। ছড়ার ভাব বা চিত্ররাশি অসংবদ্ধ অবস্থায় থাকে। এরূপ ধারনা থেকেই এমন নামকরণ হয়েছে। তবে ছড়ায় বিচিত্র ভাবের মধ্যে অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আছে, ঐক্যসূত্র আছে। ছন্দের মাধ্যমে ধ্বনিগ্রাহ্য বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে। ছড়ায় স্বপ্নদর্শী রাজ্যের মধ্যেও মানুষ, সমাজ, সংসার, প্রকৃতি[১] ও বিশ্বলোকের নানা বস্তব চিত্র আছে।

মুনি ঘুমালো পাড়া জুড়ালো
বর্গী এলো দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে।

(রাজবাড়ী)

বর্গীরা বাংলার কৃষকদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন করে খাজনা আদায় করত। বর্গী বাংলার কৃষকের কাছে যম হিসেবে প্রতিপন্ন, যার ভয় সন্তান-সন্ততির মধ্যেও প্রোথিত। উক্ত ছড়ার মধ্য দিয়ে জাতির ইতিহাসের তিক্ত অভিজ্ঞতার চিত্র সহজ, সরল ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। শিব ঠাকুরের তিন কন্যাকে দানের ট্রাজিক চিত্র বাঙালী সমাজে রয়েছে। ব্রাহ্মণাবাদ নির্দেশিত বর্ণপ্রথার কারণে কন্যা সম্প্রদানে জাত-পাত বিচার্য। নিরুপায় কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা একই বরের কাছে তিন কন্যা দানে বাধ্য হতেন। ভাব, ভাষা, রস, রুচি, ছন্দ, রূপ, শৈলী মিলে ছড়ার নিজস্ব ভুবন রচিত হয়, যা লোসাহিত্যের অন্য কোন শাখায় নেই। আবৃত্তির মাধ্যমে ছড়ার বিশিষ্টতা প্রকাশিত হয়। ছড়ার ব্যাপ্তি দুই থেকে আট, দশ, চরণ পর্যন্ত হতে পারে।

কোন কোন লোকবিজ্ঞানী ছড়াকে লোকসাহিত্যের আদিমতম সৃষ্টি বলেছেন। মানুষের ভাব-ভাবনা যখন স্পষ্ট হয়নি, ভাষা যখন হাঁটি হাঁটি পা পা করে চলতে শুরু করেছে তখনই ছড়াগুলোর প্রথম সৃষ্টি। কর্মময় জীবনে জননী সন্তানকে শান্ত করার প্রয়োজনে নানা ছলা-কলার মাধ্যমে ছড়া আবৃত্তি করে শিশুকে শান্ত করে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করে। পরবর্তীতে এই শিশু নিজেই খেলা করতে গিয়ে ছড়া তৈরী করে।[২]

ছড়া সৃষ্টিতে শিশুরা যেমন উপলক্ষ তেমনি ছড়ার লালনে কিশোরদের ভূমিকাই মুখ্য। শিশু যেমন প্রাচীন, তেমনি নতুন। ছড়াও ঠিক তেমনি পুরাতন হয়েও চির নতুন। ছড়া সম্পর্কিত তাত্ত্বিক আলোচনায় অগ্রণী ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। তিনি বিভিন্ন সময়ে ছড়া সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন তাঁর ভাষায়।

Dhaka University Institutional Repository

১।"ছড়া মানব মনে আপনি বিকাশ লাভ করে, ছড়ার মধ্যে পরস্পর ভাবের সম্বন্ধ কতগুলো অসংলগ্ন ছবি নিতান্ত সামান্য প্রসঙ্গ সূত্র অবলম্বন উপস্থিত হয়।"

২। "গাম্ভীর্য নয়, অর্থের মার প্যাচ নয়, সহজ সরল সুরময় ধ্বনিই ছড়ার প্রাণ।" সুকুমার সেন মনে করেন, ছড়াই সর্বকালের আদিম কবিতার বীজ। তাঁর মতে, "লোকসাহিত্যের যে শাখাটি অন্তঃপুরের আঙিনায় স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করেছে তা ঘুম পাড়ানি ও ছেলে ভুলানো ছড়া ।" এই ধরনের ছড়ার মধ্যেই লুকিয়ে আছে সর্বদেশের, সর্বকালের আদিম কবিতার বীজ, বাণীর প্রথম অঙ্কুর। আদি মানব জননীর কণ্ঠের অর্থহীন ছড়ার টানা সুর ছন্দের জন্ম দিয়েছে। তাঁর মতে, ছড়া একদিকে যুগ যুগের পুরান ইতিহাসের ছায়া, অন্যদিকে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের উদাহরণ।

ছড়া ছন্দবদ্ধ সহজ, সরল, ক্ষুদ্র কবিতা যার অবয়ব ধ্বনিময় ও তাল প্রধান শব্দগুচ্ছ নিয়ে গড়ে ওঠে এবং যার ভঙ্গি চটুল, চঞ্চল, গতিময়, সচ্ছন্দ সাবলীল। ছড়ায় বুদ্ধিবৃত্তির চেয়ে হৃদয়বৃত্তিরই প্রাধান্য। ধ্বনির ব্যঞ্জনা, শব্দের সারল্য, ছন্দের গাঁথুনি এবং গুরুগম্ভীরতা বর্জিত চটুল ভাবনা ছড়ার প্রধান সম্পদ। ছড়ার সারল্য শিশুদের উপযোগী অবসরভোগের উপাদেয় বস্তু, কিন্তু কোন কোন ছড়াতে এই সারল্য অতিক্রম করে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মাধ্যমে গভীর সত্যকে উন্মোচনের প্রয়াস দেখা যায় :

তালগাছে সুপারী ধরে, কাঁঠাল গাছে তাল,
খঞ্জন পাখির নাচনা দেখে ব্যাঙে মারে ফাল।[৩]

ছড়াটিতে অক্ষমের অনুকরণ প্রবণতাকে কটাক্ষ করা হয়েছে।

ছড়া সংগীতের পূর্ব পর্যায়। সংগীত গীত হয় আর ছড়া আবৃত্তি করা হয়। ছন্দ, সুর ও সৌন্দর্য চিরকালই মানুষকে আনন্দ দেয়। ছড়ার সুসামঞ্জস্যময় শব্দরাজি পূর্ণ আবৃত্তি অনিদ্রা রোগগ্রস্থ রোগীদের নিদ্রা আনতে সাহায্য করতে পারে।

শিশুকে ঘুম পাড়ানোর জন্য মা যখন ছন্দে ছন্দে সহজ সরল বাক্যের ক্ষুদ্র মালা গাঁথেন তখনই ছড়ায় পরিণতি লাভ করে। শিশুকে মা পায়ের উপর দুলিয়ে নানা ছড়া কাটতে থাকে। শিশু তন্ময় হয়ে মায়ের মুখের ছড়া শুনতে শুনতে কল্পলোকের রাজ্যে গিয়ে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে। যেমন-

ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি মোদের বাড়ি যেয়ো
বাটা ভরা পান দেব গাল ভরে খেয়ো।
শান বাঁধানো ঘাট দেব বেসন মেখে নেয়ো
শীতল পাটি পেতে দেব শুয়ে ঘুম যেয়ো।[৪]

Dhaka University Institutional Repository
সুর ছন্দে আদরে মমতায় স্নেহে দোল খেতে খেতে ঘুমের মাসি পিসি এক সময় শিশুকে ভর করে, মায়ের প্রত্যাশা হয় পূর্ণ।সাহিত্যের বিকাশমান ধারায় ছড়ার গুরুত্ব অপরিসীম। পর্যায়ক্রমিক চর্চার মধ্যে দিয়ে বাংলা লোকসাহিত্যের ছড়া একটি বিশিষ্ট ধারারূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। আবহমানকাল ধরে বাংলা লোকসাহিত্যের ছড়ায় রয়েছে বাঙালীর জীবন ধারার প্রতিচ্ছবি, পূর্ব পুরুষের স্মৃতি, অতীত-ঐতিহ্য, মাতৃতন্ত্রের প্রভাব, দাস প্রথা, বাল্য বিবাহ, পরিবারিক জীবনধারা, কৃষি, অর্থনৈতিক অবস্থা, ধর্ম-সংস্কার, রাজনৈতিক ঘটনা।

ছড়া প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে রচিত হতে পারে, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে হতে পারে, প্রেম, মিলন, বিরহ ইত্যাদিও ছড়ার বিষয় হতে পারে।

ছড়া লোকসাহিত্যের একটি জনপ্রিয় শাখা। প্রচলনের ব্যাপ্তিতে, আনন্দ ও রসের উৎসারণে ছড়া বাস্তবিক বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। ভাষা ও ইতিহাস নির্ণয়ের জন্য ছড়ার বিশেষ মূল্য রয়েছে। ছড়া শিশুর মত চঞ্চল, আনন্দময়, অকপট, ছড়া শিশু-কিশোর বালক-বালিকাদের এমনকি বয়স্কদেরও আনন্দ রাজ্যের সোনালী ফসল, লঘু, চপল বিচিত্র অনুভূতির নৃত্য দোদুল সহজ, স্বাভাবিক ছন্দে বাণীরূপ লাভ করেছে । ছড়ার মধ্যে দিয়ে আনুভূতিক সারল্য ও বক্তব্যের অকৃত্রিমতায় ছড়াগুলোর প্রাণ সম্পদ এবং এ কারণেই ছড়ার আবেদন কোনদিন পুরানো হতে পারে না। ছড়াগুলো আদি কালের মানব-মানবীর হৃদয় হতে উৎসারিত হয়ে বর্তমান পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই এগুলো চির পুরাতন হয়েও চির নতুন, চির সুন্দর।[৫]

লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি ছড়া। ছড়া মূলত কোন বিশেষ ব্যক্তির সৃষ্টি নয়। ছড়া সৃষ্টির পেছনে সমষ্টি মনের প্রভাব কার্যকর। ভাবের দিক থেকে তেমন কোন পরিণতি ছড়ায় থাকে না, ভাবের অস্পষ্ট আভাস ও দুর্লক্ষ্য ইঙ্গিত তাতে বিদ্যমান। ছড়াগুলোতে রসের প্রাধান্য পায়, ছন্দ ঝংকারে মন বিমুগ্ধ হয়। বুদ্ধির অনুশাসনে ছড়াকে বাঁধা যায় না। ছড়ার সুনির্দিষ্ট কোন রচনাকাল নেই এবং রচয়িতারও কোন পরিচয় মেলে না। নিছক আনন্দ সঞ্চারের দিকেই ছড়ার লক্ষ্য। লঘুভার, অর্থহীন, সংক্ষিপ্ত ও বিচিত্র বলে ছড়া সহজেই শিশু মনকে আকৃষ্ট করে।[৬]

রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্য গ্রন্থে ছড়ার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন - "আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ু স্রোতে যদৃচ্ছা ভাসমান। দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়াও কলাবিচার শাস্ত্রের বাহিরে, মেঘবিজ্ঞান ও শাস্ত্র নিয়মের মধ্যে ভাল করিয়া ধরা দেয় নাই।"

Dhaka University Institutional Repository

ছড়ার বিষয়বস্তু অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। শিশু জীবনের বিভিন্ন পর্যায় অবলম্বনে ছড়া, যেমন- ছেলে ভুলানো ছড়া, খেলাধূলার ছড়া, নানা ধরনের মেয়েলি ছড়া, বিবাহ, প্রকৃতি ব্যবহারিক জীবন, উৎসব, নীতি, কৃষি ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়াবলম্বনে অজস্র ছড়া রচিত হয়েছে।[৭]

রূপ ও বিষয়গত বৈচিত্র্য ঃ ছড়া লোকসাহিত্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ শাখা। এর প্রচার সর্বাঞ্চলীয়। বাংলাদেশের সর্ব অঞ্চলেই ছড়ার প্রচলন রয়েছে। ভাব, ভাষা, ছন্দ, রস, রুচি, রূপ, শৈলী মিলে ছড়ার নিজস্ব ভুবন রচিত হয়। বৃহত্তর ফরিদপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছড়ার মধ্যেও উপরোক্ত বৈচিত্র্য বিদ্যমান। দুই চরণ থেকে দশ/বার চরণ পর্যন্ত বিস্তৃতি, অন্তমিল, দ্রুত লয়, ধ্বনি মাধুর্য, ছন্দ বৈচিত্র্য ইত্যাদি মিলে বৃহত্তর ফরিদপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছড়াগুলো মনোমুগ্ধকর, চিত্তচাঞ্চল্যকর, আনন্দময়তার সৃষ্টি করে।[৮]

ছড়ার দুই চরণ থেকে দশ/বার চরণ পর্যন্ত ঔলম্বিক ব্যাপ্তি হতে পারে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া হল :

১।পদ্মা নদী তি-তি।
জামাই আলো নিতি।
২।তাই তাই তাই,
কুটি আতের মোয়া খাই।
মোয়া নিলো শিয়ালে,
বুঝবানে কাইল বিয়ালে।

(ফরিদপুর)

৩। জামাই আইছে ঘামাইয়া,
ছাতি ধর টানাইয়া।
ছাতির উপর বললা,
ধর জামাইর কল্লা।
ছাতির উপর ভোমর,
ধর জামাইর কোমর।

(মাদারীপুর)

৪। উস্তা কুটলাম চাক চাক,
জামাই আইলো ঝাক ঝাক।
জামাই আইছে বসপার দে,
থাল থুইয়া নাস্তা দে,
নাল মোড়গডা জবো দিয়া

Dhaka University Institutional Repository

জামাইর পাতে দে।
ধামা ধামা পিঠা বানাইয়া
জামাইর পাতে দে।

(রাজবাড়ী)

৫।আলতা আলতা তালপাতা,
বাবু গেছে কলিকাতা।
আনতে কইছি সোনার চুড়ী,
আইন্যা বইছে রূপার চুড়ী।
ও চুড়ী পরবো না,
ম্যায়া বিয়া দিবো না।
ম্যায়ার মাতায় কোকড়া চুল,
বানতে লাগে কুসুম ফুল।
কুসুম ফুলের গন্ধে,
জামাই আসে আনন্দে।
খাওরে জামাই বাটার পান,
সুন্দরীরে করি দান।

(গোপালগঞ্জ)

আত্মকথন মূলক ছড়া ঃ

সাধারণত একবচন বা বহুবচনে উত্তম পুরুষের উক্তি হিসেবে এরূপ ছড়া রচিত হয়।

দৃষ্টান্তঃ

১। উত্তরে গেছিলাম,
কৈ মাছ খাইছিলাম।
কৈ মাছের তেলে,
পেট আমার জ্বলে।

(মাদারীপুর)

২। ডুক্কু ডুক্কু কানাইয়া,
নাও দিমু বানাইয়া।
নাও যদি বাঁচে,
বিয়া করমু পাছে।

(শরীয়তপুর)

Dhaka University Institutional Repository

সংলাপধর্মী ছড়া ঃ

সংলাপের ভঙ্গিতেও রচিত হয়ে থাকে ছড়া। ছেলে ভুলানো ছড়ায় শিশুকে এবং খেলার ছড়ায় প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে এ ধরনের ছড়া কাটা হয়। মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানার শশীকর গ্রামে এমন একটি ছড়ার প্রচলন দেখা যায়ঃ

১ম দল- ওয়া ওয়া,
২য় '' - কানদস কেন?
১ম '' - বাঘের ডরে,
২য় '' - বাঘ কই?
১ম '' - মাটির তলে,
২য় '' - মাটি কই?
১ম '' - ওই দুরে,
২য় '' - তোরা 'ক' ভাই?
১ম '' - এক কুড়ি সাত ভাই,
২য় '' - এক ভাই দিবিনে,
১ম '' - ছুতে পারলে নিবিনে।

(মাদারীপুর)

সম্মোধনমূলক ছড়া ঃ

মানুষ, নৈসর্গিক বস্তু, পশু-পাখি, চাঁদ-সূর্যকে সম্বোধন করে ছড়া রচিত হয়। আয়, আয়রে গো, লো, ও, ওলো ইত্যাদি প্রচলিত সম্মোধনসূচক শব্দের ব্যবহার করা হয়।

দৃষ্টান্ত ঃ

১। আয়রে চান নইরা চইড়্যা,
বাঁশ বাগানের ভিতর দিয়া।
কলা গাছের উপর দিয়া,
খোকার কপালে টিপ দিয়ে যা।

(শরীয়তপুর)

২। হ্যাদে লো বুন ম্যাগা রানী,
জব জবাইয়া ফ্যালা পানি।
চিনা বনে চিনচিনানি,
দান (ধান) বনে আটু পানি।
কলা বনে গলা পানি,
ম্যাগেরে দিলাম গুয়া পান
জব জবাইয়া বিষ্টি নাম।

(ফরিদপুর)

Dhaka University Institutional Repository

এক এক প্রক্রিয়ায় ছড়ার এক একটি কাঠামো গড়ে ওঠে। ছড়া যখন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করে তখন কালিক ও স্থানীয় ঐতিহ্য ও পরিবেশের প্রভাবে বাণীর হের ফের হয়, কিন্তু কাঠামোটি প্রায় অপরিবর্তিত থাকে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঃ

১

আমতলা ঝামুর ঝুমুর
কাঠালতলা বিয়া,
আসতাছে নৌসা মিয়া।
পিঠার থালা নিয়া,
ও পিঠা খাবনা
ম্যায়া বিয়া দেব না।
ম্যায়ার মাথায় লম্বা চুল,
কোথায় পাব কুসুম ফুল
কুসুম ফুলের গন্ধে,
খোপা নাচায় নন্দে।
ম্যায়া নিবা সাজায়্যা,
টাকা দিবা ব্যাজায়্যা।

(রাজবাড়ী)

২

আমতলা ঝামুর ঝুমুর,
কাঠাল তলা বিয়া
ঐ আসতেছে নন্দের জামাই
সেওইর গামলা নিয়া
ও সেওই খামুনা মেয়্যা বিয়া দিমু না।
মেয়্যার মাথায় লম্বা চুল
কোথায় পাব কুসুম ফুল।
কুসুম ফুল ঝোলে,
জামাই আইস্যা ডোলে
জামাইর ঘরে নুরা ধান
ঢেকুর ঢেকুর বাড়া বান।

(ফরিদপুর)

উক্ত ছড়াদ্বয়ে কথান্তরে ভাষায় ও বক্তব্যে পরিবর্তন এসেছে। একটি ছড়ায় আছে পিঠার কথা অন্যটিতে সেওইর (সেমাইর) কথা। ছড়ার শেষে একটিতে আছে পণ প্রথার চিত্র, অন্যটিতে আছে অবস্থাপন্ন গৃহস্থ জামাইর গোলায় ধানের পরিপূর্ণতার কথা।

Dhaka University Institutional Repository

ছড়ায় সমাজচিত্র বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত বৃহত্তর ফরিদপুরের জনজীবনে ছড়ার ব্যাপক প্রচলন ও প্রভাব রয়েছে। বিভিন্ন উপলক্ষ্যে ছড়াগুলো রচিত হয়ে থাকে। গ্রাম্য নানী-দাদী বা মাতৃ স্থানীয়া নারীরাই মূলত ছড়া গুলোর আবৃত্তিকার। ছোট ছেলে মেয়েদের ঘুম পাড়ানোর জন্য নিম্নোক্ত ছড়াটি বৃহত্তর ফরিদপুরের সর্বত্রই ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ও পরিচিত ।[৯]

আয়রে চান নইড়া চইরা
টেংরা মাছের ঘাড়ে চইড়্যা।
গাই দুহাইয়া দুধ দিবো,
বারা বাইন্যা খুদ দিবো,
আয়রে চান আয়।
খুকুর চোখে ঘুম দিয়ে যা।

বিয়ে বাঙালীর জীবনের চিরন্তন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথা। বিয়েতে নানা সমাজে, ধর্ম ও বর্ণে নানা ধরনের আচার, অনুষ্ঠান পালিত হয়। গ্রামীণ সমাজে বিয়ের অনুষ্ঠানে ছড়া কাটা চির পরিচিত আনন্দের উপাদান। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত বৃহত্তর ফরিদপুরের বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত বিয়ে সংক্রান্ত ছড়াগুলোর মধ্যে বাঙালী সমাজের জীবনাচরণের চিত্র পাওয়া যায়।[১০]

রাজবাড়ী থেকে সংগৃহীত ও পূর্বে উল্লিখিত "আমতলা ঝামুর ঝুমুর" ছড়াটিতে তৎকালীন বাঙালী সমাজের চিত্র পাওয়া যায়। তখনকার সময়ে মিষ্টির বদলে বর পক্ষ কর্তৃক কন্যা পক্ষের বাড়ীতে পিঠা নিয়া আসার প্রচলন ছিল এবং মেয়েকে পরিপূর্ণ গহনা ও সাজ-সজ্জার জিনিস দিয়ে সাজিয়ে নেয়া ও কন্যার বাবাকে কন্যাপণের টাকা বুঝিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে যেতে হত। আধুনিক যুগে বরপণেরই ব্যাপক প্রচলন আছে । কন্যাপণ প্রাচীন সমাজবাবস্থার ফল । মাতৃতান্ত্রিক সমাজের বিবাহরীতিতে কন্যাপণের রীতি আজও চালু আছে । ছড়াটি এ অঞ্চলের প্রাচীন প্রথারই নিদশন বহন করে।

তৎকালীন সমাজে শিশু বয়সে মেয়ে বিয়ে দেয়ার প্রচলন ছিল। শিশু মেয়ে বিয়ে দিয়ে অভিভাবকদের চিন্তার অন্ত ছিলনা । নিম্নোক্ত ছড়ায় এ চিত্রটি স্পষ্ট হয়েছে।

বাপ যায়রে নায়ে নায়ে, খুড়ো যায়রে তড়ে।
শিশুকালে বিয়া হৈলে সদাই আগুন জ্বলে।
খুড়ী কান্দে জেঠী কান্দে সকল কান্দে পর,
মা জননী কান্দে বেলা আড়াই পর।
খুড়ীলো জেঠীলো মাকে নে যা ঘরে।
মায়ের কান্দনে আমার ডুলি পাক পাড়ে।[১১]

(ফরিদপুর)

Dhaka University Institutional Repository

শ্বশুর বাড়ীতে বধূকে থাকতে হয় পরাধীন। বাপের বাড়ীতে শত ইচ্ছে থাকলেও নিজে নিজে যেতে পারে না তার জন্য অনেকের অনুমতির প্রয়োজন হয়। নিম্নোক্ত ছড়াটিতে
বাঙালী বধূর পরাধীনতার চিত্র ব্যক্ত হয়েছে :

লাউ কাটুনি, শাক বাছনী শাশুড়ীরে
নাইয়রের তা নিবার আইছে দেবানিকি রে
আমি কি জানি বউ তোমার নাইওর আছে?
জিজ্ঞাসা কর গিয়া তোমার ননদিনীর কাছে।
জ্বালা দেওয়ানি, নিস্পিরা দেওয়ানি ননদিনীরে
নাইওরের তা নিবার আইছে দিবানিকি রে,
আমি কি জানি ভাবি তোমার নাইওর আছে।
জিজ্ঞাসা কর গিয়া তোমার দেওরের কাছে।
ওচ কোপানো, কোচ কোপানো দেওরা রে
নাইওরের তা নিবার আইছে দেবানিকি রে।
আমি কি জানি তোমার নাইওর আছে
জিজ্ঞাসা কর গিয়া তোমার সোয়ামীরে।

(মাদারীপুর)

ছড়াটিতে শ্বশুর বাড়িতে গ্রাম্য বধূর শৃঙ্খলিত জীবন ও নিষ্পৃষ্ট অবস্থানের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

বাঙালী সমাজে মেয়ের জামাই আদর বেশ গুরুত্বপূর্ণ। শ্বশুর বাড়ীতে জামাইকে যত্ন সহকারে বসতে দিয়ে বড় মোরগ জবাই করে, বিভিন্ন রকমের পিঠা তৈরী করে খাওয়ানোর রেওয়াজ বর্তমানেও রয়েছে। মেয়ে জামাইদের দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানোর চিত্র পাওয়া যায় নিম্নোক্ত ছড়ায় :

উস্তা কুটলাম চাক চাক,
জামাই আইলো ঝাক ঝাক।
জামাই আইছে বসপার দে,
থাল থুইয়া নাস্তা দে,
নাল মোড়গডা জবো দিয়া
জামাইর পাতে দে।
ধামা ধামা পিঠা বানাইয়া
জামাইর পাতে দে।[১২]

(রাজবাড়ী)

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন সমাজে বহুবিবাহের প্রচলন ছিল ব্যাপকভাবে। এক জনের একাধিক স্ত্রী থাকায় সাংসারিক বিড়ম্বনাও ছিল :

বড় মামী রান্দে বাড়ে
ছোট মামী খায়,
মাইঝা মামী গাল ফুলাইয়া
বাপের বাড়ী যায়।

(শরীয়তপুর)

কিশোর কিশোরীরা খেলা করার জন্য ছন্দ মিলিয়ে ছড়া কাটে। এর বিশেষ উদ্দেশ্য নেই। তবে কিছু ছড়ায় অর্থ আছে। যেমন -

গিননি শোগুন
কানে বাগুন
বাঁশতলা তোর ঘর
তুই কোনচি[১] কাটিয়া মর।
কোনচির আগায় দোড়া সাপ[২],
ওরে বাপরে বাপ।
দোড়া সাপের কোড়া বিষ
বাদয়া[৩] আইলে কোইয়া দিস।[১৩]

(গোপালগঞ্জ)

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের কৃষকেরা এক সময় চাষবাসে ছিল প্রকৃতি-নির্ভর। সময়মত বৃষ্টি না হলে কৃষকেরা বীজ বুনতে পারত না। তাই বৃষ্টি নামানোর জন্য বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত বৃহত্তর ফরিদপুরের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টিকে আহবান করে ছড়ার প্রচলন ছিল। জসিমুদ্দিনের নকসী কাঁথার মাঠে বৃষ্টি নামানোর জন্য 'বদনা বিয়ে' নামক অনুষ্ঠানের প্রচলন দেখা যায়। কৃষকের ছেলে-মেয়েরা বৃষ্টির উপাদান মেঘকে বিভিন্ন ভাবে আদর সম্ভাষণ করে থাকে। উদাহরণ -

হ্যাদে লো বুন ম্যাগা রানী,
জব জবাইয়া ফ্যালা পানি।
চিনা বনে চিনচিনানি,
দান (ধান) বনে আটু পানি।
কলা বনে গলা পানি,
ম্যাগেরে দিলাম গুয়া পান
জব জবাইয়া বিষ্টি নাম।

১। কোনচি-চিকন বাঁশের ডাল, ২। দোড়া সাপ-(<ঢোড়া সাপ)-বিষহীন সর্প বিশেষ। সাধারণ জলাশয়ে থাকে। ৩। বাদয়া (<বাদিয়া)-জাতি বিশেষ: সাপ ধরা, সাপের খেলা দেখানো এদের পেশা।[১]

Dhaka University Institutional Repository

(ফরিদপুর)

অনাবৃষ্টি ও খরার হাত থেকে ফসলকে রক্ষার জন্য যেমন ছড়া কাটা হয়, তেমনি অতিবৃষ্টি হতে মুক্তি পেয়ে খরার প্রত্যাশায় মানুষ ছড়া কাটে। অতি বৃষ্টিতে নিম্নবৃত্তের মানুষ কাজে যেতে না পারলে না খেয়ে থাকতে হয়। গরুকে ঘাস খাওয়ানোর জন্য মাঠে যেতে পারে না। এ সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য লোক-বিশ্বাস অনুসারে আম গাছে ভাঙ্গা সরা বেঁধে দিয়ে খরা কামনা করা হয়েছে নিম্নোক্ত ছড়ায় ঃ

এক তারা ভাই ঠডি বডি,
দুই তারা ভাই বাগুন বডি।
তারারা সতেক ভাই,
তারা বাইন্দা ঘরে যাই।
গরু মরে ঘাসে,
মানুষ মরে ভাতে
আম গাছে ভাঙ্গা হরা[১]
কালকে হবি ঠনঠনে খরা।

(মাদারীপুর)

বিভিন্ন খেলাকে উপলক্ষ করে গ্রামের ছেলেরা ছড়া কেটে থাকে। হা-ডু-ডু, দাড়িয়া বান্দা, গোল্লাছুট, বউচি প্রভৃতি খেলা ছড়ার মাধ্যমে জমে ওঠে। এসব খেলা নিয়ে নানা ধরনের ছড়া প্রচলিত আছে বৃহত্তর ফরিদপুরের বিভিন্ন জেলায়। নিম্নে খেলা বিষয়ক কিছু ছড়ার উল্লেখ করা হল ঃ-

১।এতি তলা বেতি তলা
তা ধমকা ফুলের মালা
ফুলটি গেল ছুটে
খেলাটি গেল মিটে।

(গোপালগঞ্জ)

২। ছি কুত কুত তাইয়া,
বাবুলের মাইয়া।
বাবুলে কান্দে,
কচি কাঁঠাল খাইয়া।

(রাজবাড়ী)

১। হরা<সরা = ঢাকনা।

Dhaka University Institutional Repository

৩। উত্তরে গেছিলাম
কই মাছ খাইছিলাম
কই মাছের তেলে
পেট আমার জ্বলে।

(মাদারীপুর)

ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির রাত্রে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 'গাশশি' নামক একটি আঞ্চলিক পর্ব উদযাপন করতে দেখা যায়। এই দিনে ছোট্ট একটি ঘর নির্মাণ করা হয়। উক্ত ঘরটির সম্মুখের কিছুটা অংশ বৃত্তাকারে 'আলা মাটি' দিয়ে লেপন করে বিভিন্ন ধরনের গাছের পাতা, নারকেল, তালের আটি, তিল প্রভৃতি ফলমূল ঐ বৃত্তাকার অংশে রেখে দেয়া হয়। সূর্যাস্তের পর 'ঝুলাভাতি' রান্না করে পরদিন সূর্যাস্তের আগেই সংগৃহীত লতাপাতা বেঁটে শরীরে মেখে গোসল করা হয়। এরপর আগের দিন সংগৃহীত নারকেল, তালের আটির ভিতরের শাশ, তিল, গুড়, আতপ চাল রান্না করে বাদ্য-বাজনা বাজিয়ে আনন্দচিত্তে খাওয়া হয়।

এই গাশশি পর্বে মূলত কৃষিভিত্তিক আশ্বিন মাসে ধানের সাধভক্ষণ হয়। ধান জমিতে ভাল থেকে পরিপুষ্ট হয়ে পাকার পর যাতে ঘরে তোলা যায় সেই মঙ্গল কামনায় ও গাশশি অনুষ্ঠান করা হয়।

গাশশি জাগো জাগো
ভালো কইরা জাগো
আশ্বিনে রান্ধে কার্তিকে খায়
যে বর মাঙ্গে সেই বর পায়।
গাশশি জাগো জাগো
অলদি জাগো, তুলসী জাগো,
কুলা জাগো, চালুন জাগো,
নারকেল জাগো, ভাল কইরা জাগো
গাশশি[১] জাগো, ভালো কইরা জাগো।[১৪]

(ফরিদপুর)

ফরিদপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কার্তিক মাসে শ্যামা পূজার ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ায় বড় বোন ছোট ভাইয়ের কপালে চন্দন ফোটা দেয়। এই দিবসে বড়

১। গাশশি<গাসী = কৃষি সংক্রান্ত অনুষ্ঠান । হিন্দু সমাজে গাসী ব্রতের প্রচলন আছে। গাসী আঞ্চলিক উচ্চারণে গাশশি হয়েছে । আশ্বিন মাসের শেষ দিনে অনুষ্ঠানটি হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

বোন কর্তৃক ছোট ভাইকে প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য দ্রব্যাদিও উপহার দেয়া হয়। এই অনুষ্ঠানটির মধ্যে দিয়ে ভাই-বোনের স্নেহ মধুর সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভায়ের কপালে দিলাম ফোঁটা
যম দুয়ারে দিলাম কাঁটা
কাঁটা যেন সরে না
ভাই যেন মরে না।[১৫]

(ফরিদপুর)

তথ্য নির্দেশিকা ঃ

১. ওয়াকিল আহমদ, বাংলা লোকসাহিত্য ছড়া, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮, পৃ. ১-৩
২. আশরাফ সিদ্দিকী, লোকসাহিত্য, ঢাকা স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৩, পৃ. - ১৪০
৩. মজহারুল ইসলাম, ফোকলোর পরিচিতি ও লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠন, বাংলা একাডেমী ১৯৯৩, পৃ. - ৭৫
৪. ঐ, পৃ. - ৭৬
৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃ. - ১৪০
৬. ঐ, পৃ. - ১৪৪
৭. নির্মলেন্দু ভৌমিক, বাংলা ছড়ার ভূমিকা, কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃ. - ১০
৮. বাংলা লোকসাহিত্য, ছড়া, পৃ. - ৩
৯. আবু তালেব মিয়া, বৃহত্তর ফরিদপুরের লোকসাহিত্য ও খ্যাতিমানদের ইতিবৃত্ত, পৃ. - ১৩
১০. ঐ, পৃ. - ১৪
১১. বাংলা লোকসাহিত্য, ছড়া, পৃ. - ২৩১
১২. মাসুদ রেজা, ফরিদপুরের লোকসাহিত্য, ফরিদপুর শিল্পকলা পরিষদ, পৃ.- ২৭
১৩. বৃহত্তর ফরিদপুরের লোকসাহিত্য ও খ্যাতিমানদের ইতিবৃত্ত, পৃ. - ১৬
১৪. ঐ, পৃ. - ২৮

Dhaka University Institutional Repository

ধাঁধা

সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য ঃ ধাঁধা লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম ঐতিহ্যের নিদর্শন । খৃষ্ট জন্মের হাজার হাজার বছর আগেও আর্যদের দেশে ধাঁধা প্রচলিত ছিল । ঋকবেদে ধাঁধার নিদর্শন রয়েছে । ইহুদীদের গ্রন্থাবলী বাইবেল, ইরানীয় সাহিত্য, মধ্যযুগের আরবী সাহিত্য প্রভৃতি ধাঁধা দ্বারা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। ধাঁধা মানুষের স্বাভাবিক রহস্যপ্রিয়তার চিরন্তন নিদর্শন। আকারে ক্ষুদ্র হলেও সরসতা, বুদ্ধিমত্তা ও রহস্যময়তায় ধাঁধার সাহিত্যিক আবেদন অনস্বীকার্য।[১] বৃহত্তর ফরিদপুরের বিভিন্ন জেলার গ্রামাঞ্চলে ধাঁধার ব্যাপক ব্যবহার ও প্রচলন রয়েছে। এক সময় ধাঁধার আবেদন অপরিসীম ছিল। দিনের শ্রান্তি শেষে সন্ধ্যার অবসরে গ্রামের উঠান বা বারান্দায় কুপি জ্বালিয়ে শ্লোক বা ধাঁধার আসর বসত। একপক্ষ অন্য পক্ষকে শ্লোক বা ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে তার অর্থ ব্যাখ্যা করে অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করত ।

কান্দির উপর কান্দি
যে না কতি পারবি
হে আমার বান্দি[১] । (কলার মোচা)
(শরীয়তপুর)

ঘর আছে দুয়ার নাই
মানুষ আছে কতা নাই
কওনা এটা কি ভাই? (কবর)
(ফরিদপুর)

ধাঁধা Formulated thought বা নিগূঢ় চিন্তার ফল। চিন্তার কৌশলের (Mastery of thought) মাধ্যমেই ধাঁধার গুণগত মান ও মূল্য নির্ভর করে। তাই ধাঁধা রচনায় চিন্তার দক্ষতা, শব্দ প্রয়োগে কৌশলতা, ছন্দ চেতনা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

কাঁচাতে কাচ বরণ সর্ব লোকে খায়,
পাকাতে সোনার বরণ গড়াগড়ি যায়।

এর উত্তর 'বেগুন' ধাঁধাটিতে উল্লেখিত তিনটি গুণই বিদ্যমান - চিন্তা, ভাষা ও ছন্দ সমভাবে কাজ করেছে। উদ্দিষ্ট বস্তু বেগুনের কাঁচা ও পাকা অবস্থায় বর্ণগত পরিচয় ও ব্যবহারগত মূল্যের বিবরণ আছে।[২]

১। বান্দি = বাঁদী, কাজের লোক ।

Dhaka University Institutional Repository
ধাঁধা রহস্যপূর্ণ রচনা, ব্যাখ্যা দ্বারা সে রহস্যভেদ করতে হয়। এ্যালান ডান্ডিস এর মতে, In the riddle referent of the descriptive element is to be guessed. অর্থাৎ ধাঁধার উত্তরটি বিবরণের ভেতর থেকে অনুমান করে বের করতে হয়। বিখ্যাত জার্মান লোক বিজ্ঞানী 'Fried Reich' তাঁর 'Geschichte des Rathsels' গ্রন্থে ধাঁধাকে An indirect presentation of an unknown object in order that the ingenuity of the hearer or order may be exercised in finding it out বলে ব্যাখ্যা করেছে। অর্থাৎ 'ধাঁধা' একটি অজানা বিষয়ের পরোক্ষ বিবরণ, যা পাঠক বা শ্রোতা অনুশীলন দ্বারা বের করতে পারে। প্রশ্নকর্তার কাছে বিষয়টি অজানা থাকে না কিন্তু পাঠক বা শ্রোতার কাছে অজানা থাকে। শ্রোতা উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রয়োগ করে ধাঁধার শব্দচিত্র, রূপকল্প ও ধ্বনিব্যঞ্জনা থেকে উত্তরটি বের করতে সক্ষম হয়।[৩]

কঠিন ধাঁধার উত্তর দিয়ে রাজকন্যা ও রাজত্ব লাভের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যপদেও বহু ধাঁধার ব্যবহার দেখা যায়।

(১)

দুহি দুহি পীঢ়া ধরন ল জাই,
রুখের তেন্তুলী কুম্ভীরে খাই।

(২)

দিবসহি বহুড়ী কাউহি ডর ভাই,
রাতি ভইলে কামরুপ জাই।

উন্নত ধরনের সাহিত্যিক ধাঁধার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ষোড়শ শতকে ঃ

যার গর্ভে জন্ম লয়, নাহি তারে মায়া।
জন্মিয়া ভক্ষণ করে জননীর কায়া।
বাসিনা সম্বল রাখে দরিদ্র লক্ষণ,
আশ্রয় জনবর পীড়া করে অনুক্ষণ।
(অগ্নি)
(ধর্মমঙ্গল, ঘনারাম চক্রবর্তী)[৪]

মুকুন্দ রামের চন্ডীমঙ্গলে কাব্যের বণিক খন্ডে ডিম সম্পর্কিত ধাঁধাটির বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে,

বিধাতা নির্মাণ ঘর নাহিক দুয়ার।
তাহাতে পুরুষ এক বৈসে নিরাহার।
যখন পুরুষ বর হয় বলবান
বিধাতার ঘর ভাঙ্গা করে খান খান।

Dhaka University Institutional Repository

ধাঁধা মানুষের মনে আনন্দ ও রসানুভূতির সঞ্চার করে। ধাঁধায় লোকজীবন, লোকসংস্কৃতি ও লোকসমাজের চিত্র পরিস্ফুট হয়। বুদ্ধি, কল্পনা, কৌতূহল, আনন্দ ও রসবোধ মিলে ধাঁধায় একটি শিক্ষিত মনের ছাপ বিরাজ করে ঃ

দেশ আছে, মানুষ নাই
সমুদ্রেতে জল নাই,
পাহাড়েতে পাথর নাই,
রেল লাইনে গাড়ি নাই
বন্দরেতে জিনিস নাই,
জিনিসটি কি বলনা ভাই।[৫]

(মানচিত্র)

প্রতিদিনের ব্যবহার্য জিনিসের বিষয়কে অবলম্বন করেও চিন্তার অনুশীলন বুদ্ধির বিকাশ ও কল্পনার অভিযান শুরু হতে পারে।

গৃহস্তের আতি, নিত্য খায় নাতি। (ঢেঁকি)

(মাদারীপুর)

বিয়ে-শাদীতে, মজলিস দরবারে, রুছমতের সময় গ্রামীণ বাংলায় এখনো ধাঁধার প্রচলন দেখা যায়। বর অন্দর মহলে, মেয়ে মজলিসে গেলে ধাঁধা জাতীয় শ্লোকের মাধ্যমে রীতিমত প্রতিযোগিতা চলে। এক পক্ষের শ্লোকের মাধ্যমে অপর পক্ষকে আটকানোর চেষ্টা করা হয়।

তিন জীবের তেইশ কান,
শর্ত ভাঙ্গায়া শরবত খান,
শর্ত ভাঙ্গায়ে না খাইলে পান,
কাঁটা যাবে বর যাত্রীদের কান।

(ফরিদপুর)

Dhaka University Institutional Repository

গঠন, রূপ ও বিষয়গত বৈচিত্র্য ঃ 'ধন্ধ' থেকে ধাঁধা শব্দের উৎপত্তি। ধাঁধা অর্থ ধোঁকা, সংশয় কৌতূহলজনক ও বুদ্ধি বিভ্রমকারী প্রশ্ন। ধাঁধাঁ একটি সংশয়াচ্ছন্ন প্রশ্ন। বর্ণনার কৌশলে রহস্যময়তার বাতাবরণে রচনা করা হয়। রূপক, সংকেত, উপমা, তুলনা, অতিশয়োক্তি, শ্লেষ ইত্যাদির সাহায্যে রহস্যপূর্ণ প্রশ্ন রচনা করা হয়। প্রশ্ন আছে বলে ধাঁধার একটি উত্তরও আছে।[৬] রূপক সংকেত উপমার ভেদ ভেঙ্গে ধাঁধার উত্তর বের করতে হয়। প্রশ্ন ও উত্তর মিলে ধাঁধা পূর্ণাঙ্গ হয়। ধাঁধার চর্চায় দু'জনের উপস্থিতি বা দুটি পক্ষ থাকতে হয়। দুজন বা দুদলের পক্ষের মধ্যে প্রশ্ন ও উত্তর পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে ঃ-

চোর নয় কিন্তু হয় সর্ব স্বার্থপর,
রাক্ষস নয় কিন্তু শুষে শোণিতনিকর।
সর্প নয় কিন্তু থাকে গর্তের ভিতর,
ভূত নয়, প্রেত নয়, কিন্তু নিশাচর। (মশা)
(মাদারীপুর)

নাই গাছ তার শুধু পাতা,
মুখ নাই সে কয় কতা।
বুদ্ধি নাই তার আপন ধরে,
বুদ্ধি বিলায় যারে তারে। (বই)
(গোপালগঞ্জ)

বৃহত্তর ফরিদপুরের মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জ জেলায় প্রচলিত উপরোক্ত ধাঁধা দুটিতে বুদ্ধিমত্তা, কৌতূহল ও শব্দ ছন্দ প্রয়োগের চমৎকারিত্ব লক্ষণীয়।

ধাঁধা মূলত এক পক্ষ অন্য পক্ষকে Challange স্বরূপ করে থাকে। প্রশ্নকর্তার আক্রমণ, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও তিরস্কার মূলক বাক্য দ্বারা ধাঁধা তৈরী করে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে উত্তর আদায় করা। অনেক সময় ধাঁধা রচয়িতাগণ প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য কঠিন ভাষায় বিদ্রূপ করে ।

১। আগায় খসখস গোড়ায় মৌ
যে না কইতে পারবে সে সোনা সুচির বৌ। (আখ গাছ)
(মাদারীপুর)

২। আগায় ঝন ঝন গোড়ায় মুঠা
এই শ্লোক না ভাঙ্গতে পারলে তার বাপ চোট্টা। (ঝাড়ু)
(ফরিদপুর)

শব্দকে নানা কৌশলে প্রয়োগ করে ধাঁধার রহস্য জাল রচনা করা হয়। শব্দ ব্যবহারের কৌশল দ্বারা 'মানুষ' সম্পর্কিত ধাঁধাটি অত্যন্ত চমৎকারভাবে রচিত হয়েছেঃ-

Dhaka University Institutional Repository

পা, পিষ্ঠ, মাথাটি
দুই হাত, কুড়ি আঙ্গুল, নাকটি,
চক্ষু, কর্ণ, নাই।
জিনিসটি কি বলনা ভাই।

ধাঁধাটি নির্মিত হয়েছে 'নাই' শব্দের ব্যবহার কৌশল দ্বারা। 'নাই' এখানে নাভি অর্থে ব্যবহৃত নঞর্থক শব্দ হিসেবে নয়।

আনতে গেলাম তোরে
ধইর‍্যা বইলি মোরে।
ছাইড়া দে মোরে
লইয়া যাই তোরে। (বেতফল ও বেতকাঁটা)
(মাদারীপুর)

চার চরণের ধাঁধাটির প্রতোক চরণে একটি পূর্ণ ও একটি অপূর্ণ পর্ব রয়েছে। প্রত্যেক চরণে অন্ত মিল রয়েছে। ধাঁধাটি ক্রিয়া প্রধান এবং এতে বৈপরীত্য রয়েছে।

আইলো পাখি ঝন ঝনাইয়া
বইলো পাখি পাখ ছড়াইয়া। (জাল)
(গোপালগঞ্জ)

দুটি পংক্তির চরণে ৪টি পর্ব। প্রত্যেকটি পংক্তির দুটি পর্ব যা পূর্ণ। অন্ত মিল রয়েছে। প্রথম পংক্তির শেষ পর্বে রয়েছে ধ্বনাত্মক শব্দ দ্বৈত। অবকাঠামোর দিক দিয়ে ক্রিয়া প্রধান। প্রথম পংক্তিতে ধাঁধার সূচনা এবং শেষ চরণে মূল বক্তব্য বিন্যস্ত।

উপরে ঝাপি ঝুপি
নীচে কম্প বাঁপ
ফল হয় না ফুল হয় না
ধরে বার মাস। (পান)
(মাদারীপুর)

চার পংক্তিতে রচিত ধাঁধাটির প্রথম দুই পংক্তিতে একটি করে পূর্ণ ও একটি করে অপূর্ণ পর্ব রয়েছে। তৃতীয় পংক্তিতে দুইটি পূর্ণ পর্ব এবং শেষ পংক্তিতে একটি

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ণ ও একটি অপূর্ণ পর্ব রয়েছে। বৈপরীত্য সুলভ অবকাঠামো। অস্তি ও নেতিবাচক ক্রিয়ার মাধ্যমে বৈপরীত্য দেখানো হয়েছে।

ছয় পায়ে আসে
চার পায়ে বসে
দুই পায়ে খসে । (মশা)
(মাদারীপুর)

তিন পংক্তির ধাঁধাটির প্রত্যেক পর্বে একটি পূর্ণ ও একটি অপূর্ণ পর্ব। পংক্তির শেষ ধ্বনিতে মিলন রয়েছে। অবকাঠামোর দিক থেকে ধাঁধাটি সংখ্যাবাচক।

জাগলে পরে খুলতি হয়।
শুইতে গেলে দিতি হয়। (দরজা)
(গোপালগঞ্জ)

ধাঁধাটির ভাষাভঙ্গি ও চিত্রকল্পে অশ্লীলতার ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু উত্তরটি সম্পূর্ণ অশ্লীলতামুক্ত। ধাঁধাটির সূক্ষ্ম অশ্লীলতা পর্যায়ে পড়ে ।

জন্মে ধলা বয়সে কালা
গলায় লোহার হার।
লম্ফ দিয়া শিকার করে
কি নামটি তার? (ঝাকি জাল)
(ফরিদপুর)

চার পংক্তির ধাঁধাটি অবকাঠামোগত দিক থেকে রং বিষয়ক এবং প্রশ্নবাচক।

ধাঁধার রস রহস্যের মধ্যে দিয়ে বুদ্ধি-দীপ্তি, সৌন্দর্যবোধ, চিন্তার উৎকর্ষ, মননশীলতা প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। প্রাত্যহিক জীবনের বিষয়কে অবলম্বন করেই ধাঁধা রচিত হয়। গঠনশৈলী ও প্রকাশভঙ্গীর কারণে এই অর্থযুক্ত ধাঁধা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাবে রচিত হয়ে থাকে।[৭] লেবু সম্পর্কিত ধাঁধাটি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাবে কথিত হয়ে থাকে।

জঙ্গলে থন আইল হুইত্যা
বাতে দিল মুইত্যা
(ফরিদপুর)

Dhaka University Institutional Repository

এটটু খানি আড়া
ইচার ওড়ি ভরা।

(গোপালগঞ্জ)

বন থেকে আসিয়া
পাতে গেল বসিয়া
রস চাইতে তোকে
তখুনি দিল মোকে।

(মেদিনীপুর)

আছে ফল দ্যাসে নাই
খাই ফলের চোচা নাই। (শীল)

(রাজবাড়ী)

আকাশ থেকে পড়ল ফল
ফলের মধ্যে শুধুই জল
চোচাও নাই, বোটাও নাই

(চলনবিল)

এইঠে থুনু হইল কি ?
ভাতার চাইলে দিমু কি?
রাজার রাজ্যে নাই
রাখারীর দোকান নাই।

(জলপাইগুড়ি)

ছন্দবদ্ধ অন্তমিলযুক্ত দুই, চার, ছয় চরণ পর্যন্ত রূপকের মাধ্যমে ধাঁধার অবয়ব বিস্তৃত।

(১)

একটুখানি মিঠাই
ঘর ভরে ছিটাই।

(আলো)
(মাদারীপুর)

(২)

নাই গাছ তার শুধু পাতা,
মুখ নাই সে বলে কতা,
বুদ্ধি নাই আপন ধরে,
বুদ্ধি বিলায় যারে তারে।

(বই)
(শরীয়তপুর)

Dhaka University Institutional Repository

(৩)

মাঠের পরে কাঠের গাই,
বেধে ছেদে তার দুধ খাই।
গাই জ্যান্ত বাছুর মরা।
সেই বাছুরের গলায় দড়া।
সেই তো মায়ের মাটির মেয়ে,
দুধ খাচ্ছি সাধ মিটিয়ে।

(খেজুর গাছ ও মাটির কলস)
(গোপালগঞ্জ)

ধাঁধা সংলাপধর্মী ও গদ্যেও রচিত হতে পারে। একটি মেয়ে ছোট বাচ্চা কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক লোক জিজ্ঞাসা করল বাচ্চাটি কে?
উত্তরে মেয়েটি বলল ঃ 'বাচ্চার বাবা যার শ্বশুর তার বাবা আমার শ্বশুর । কোলের বাচ্চার সাথে মেয়েটির কি সম্পর্ক?'

(ভাই বোন)
(মাদারীপুর)

কিছু কিছু ধাঁধায় অঙ্কের সাথে অক্ষর ও শব্দজ্ঞান যুক্ত হয়ে রচিত হয়। এগুলো উত্তর দিতে গেলে ও চর্চা করলে গাণিতিক জ্ঞান বিকাশ লাভ করে।
দৃষ্টান্ত ঃ দুইজন স্ত্রী লোকের জন্য বাজার থেকে শাড়ী কিনে আনা হয়েছে। শাড়ীর দাম ও স্ত্রী লোক দুজনের মধ্যে সম্পর্ক একই, সংখ্যায় বলতে হবে। উত্তর ২০৩ দুশতিন । শব্দ ভেঙ্গেও বানান পরিবর্তন করলে 'দু সতীন' হয় । শাড়ীর দাম ২০৩ টাকা; উভয় স্ত্রীলোক পরস্পরের সতীন ।

ধাঁধা লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা হলেও জীবন্ত শাখারূপে আজও বিদ্যমান। ধাঁধার রচয়িতা অশিক্ষিত হলেও ধাঁধায় সৃজনশীলতা, মননশীলতা ও রসবোধের অপূর্ব সমন্বয় রয়েছে। ধাঁধার গঠন ও বিষয়বস্তু অনুধাবন করলে রচয়িতাদের বুদ্ধিমত্তা ও রসবোধের প্রশংসা করতে হয়। এখনো গ্রামেগঞ্জে সন্ধ্যার অবসরে ধাঁধার আসর বসে।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা ঃ

১. খালেদ মাসুকে রসুল- নোয়াখালীর লোকসাহিত্যে লোকজীবনের পরিচয়, বাংলা একাডেমী, ১৯৯২, পৃ. - ৪৭

২. ওয়াকিল আহমদ- বাংলা লোকসাহিত্য, ধাঁধা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃঃ- ১২

৩. ঐ, পৃ. - ১৩

৪. আব্দুল খালেক- মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লৌকিক উপাদান, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ. - ৩৫১

৫. বাংলা লোকসাহিত্য, ধাঁধা, পৃ. - ১৭

৬. ঐ, পৃ. - ১১

৭. আশরাফ সিদ্দিকী- লোকসাহিত্য, ঢাকা স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৩, পৃ. - ১০২

৮. কাজী দীন মোহাম্মদ, লোকসাহিত্যে ধাঁধা ও প্রবাদ, বাংলা একাডেমী ১৯৬৮, পৃ. - ২৫

Dhaka University Institutional Repository

সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য ঃ প্রবাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রচলিত কথা, ডাকের কথা। প্রবাদে সরলতা, সংক্ষিপ্ততা, বাস্তবতা, রসিকতা, ব্যঞ্জনাময়তা প্রভৃতি গুণ থাকে। মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সে সরস বাক্যে প্রকাশিত হয় তা-ই প্রবাদ। প্রবাদের ব্যবহার প্রাচীন। গুহাবাসের অন্ধকার থেকে মানুষ যখন গৃহবাসের সভ্য জীবনের ক্ষীণ আলোকে প্রথম পদক্ষেপ শুরু করেছে তখন থেকেই প্রবাদের জন্ম।

প্রবাদ একটি সার্বজনীন শিল্প। বিশ্বের সবদেশেই প্রবাদ প্রচলিত। প্রবাদের অবয়ব অর্থব্যঞ্জনা ও ব্যবহার সর্বত্র এক; জনপদের ও ভৌগোলিক অবস্থার কারণে বিষয়বস্তুর ভিন্নতা আছে। "Man proposes, God disposes" 'অভাগা যেদিকে যায়, সাগর শুকায়ে যায়' দুই দেশের দুটি প্রবাদে অর্থের নৈকট্য আছে তবে হুবহু এক নয়।

লোকসাহিত্যের ধারায় প্রবাদ ক্ষুদ্রতম রচনা। সংক্ষিপ্ত গদ্য বাক্য এবং ছন্দবদ্ধ চরণ উভয়েই প্রবাদের অবয়ব ব্যাপ্তি। প্রবাদ ক্ষুদ্র হলেও মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত ও বুদ্ধি প্রধান রচনা। আবেগ নয়, মস্তিষ্ক থেকেই প্রবাদের জন্ম, 'যে রাঁধে সে চুল বাঁধে' 'যার কাজ তারে সাজে অন্য লোকে ল্যাঠা বাজে' প্রভৃতি প্রবাদে কথা স্বল্প হলেও অর্থের ব্যাপ্তি ও গভীরতা আছে। স্বল্প কথায় অধিক অর্থ ধারণ ক্ষমতা প্রবাদ ছাড়া লোকসাহিত্যের অন্য কোন শাখায় নেই।[১]

পরিবারের কর্তা-কর্ত্রী, কিংবা রসিক ব্যক্তি প্রত্যক্ষ ঘটনা উপলক্ষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে সুন্দর সংক্ষিপ্ত বাক্যটি বলেন তা যদি শ্রোতার মনে দাগ কাটে তাহলেই সেটি প্রবাদ হয়। প্রবাদ এক শ্রোতার মুখ থেকে অন্য শ্রোতার মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে আসছে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত। কোন প্রচেষ্টা প্রচারণা ব্যতীতই অবলীলাক্রমে কালের কষ্টি পাথরে পরীক্ষিত হয়ে প্রবাদগুলো কষিত কাঞ্চনের ন্যায় অমরত্বের স্বীকৃতি লাভ করেছে ।

বাস্তব অভিজ্ঞতা, ঐতিহাসিক ঘটনা, কিংবদন্তী, চাষবাস, জলবায়ু, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি নিয়েই প্রবাদ রচিত হয়। স্পেনের ফোকলোরবিদ Cervantes- এর মতে "A proverb is a short sentence based on long experience"[২] অর্থাৎ প্রবাদ হচ্ছে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত প্রকাশ । ফরাসী দার্শনিক ফ্র্যান্সিস বেকন প্রবাদের মধ্যে একটি জাতির মেধা, বুদ্ধি ও চৈতন্যের প্রতিফলন দেখেছেন । তার মতে "The genius, wit and spirit of a Nation are discovered by their proverbs.

Dhaka University Institutional Repository

W. C. Hazlett এর মতে প্রবাদ হচ্ছে, "An expression or combination of words conveying a truth to the mind by a figure, periphrasis anti thesis or hyper bole." অর্থাৎ যে চিরন্তন সত্য-অলংকার ছন্দ মাধুর্য প্রভৃতির মাধ্যমে লোকমনে বিস্তার লাভ করেছে তাই প্রবাদ। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, "প্রবাদ হচ্ছে অর্থপূর্ণ, সংক্ষিপ্ত, সংহত বাক্য।"

দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে, সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচার-আচরণ থেকে, নৈসর্গিক পরিবর্তনের প্রভাব থেকে, বস্তু ও ব্যক্তির সম্পর্ক থেকে, রোগ-ব্যধি নিরাময়, কৃষি প্রভৃতি সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা সঞ্চয় করে যদি কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন বিষয়ে ছন্দের মাধ্যমে বাক্য বা বাক্যদ্বয় মুখে মুখে রচনা করে এবং তার সেই রচনা যদি সমাজে অথবা সেই ভাষার জনগণ দ্বারা সত্য ও আপন বলে গৃহীত হয়, তবে সেই বাক্য বা বাক্যগুলো প্রবাদ বলে গণ্য হয় এবং জাতির দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করে।[৩]

সমস্ত প্রবাদই যে প্রাচীন কালে বিশেষ যুগে জন্ম লাভ করেছে এমন মনে করবার কোন হেতু নেই। অতি প্রচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত নব নব বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের মুখ হতে এরা আপনা থেকেই বের হয়ে আসে। ভবিষ্যতেও এই ধারাটি কাব্য সাহিত্যের ন্যায় মানবসমাজে অব্যাহত থাকবে।

দৈনন্দিন কার্যের অভিজ্ঞতার অনন্য সাধারণ প্রকাশে, মানবজীবনের নিগূঢ় রহস্য উন্মোচনে স্বল্প কথায় এত ভাব প্রকাশ করা এবং এত সহজে জনপ্রিয়তা অর্জন করা এক প্রবাদ ভিন্ন অন্য কোন মাধ্যমে সম্ভব নয়।

প্রবাদ মুখে মুখে প্রচলিত হলেও কালক্রমে তা লিখিত সাহিত্যের মধ্যেও প্রবেশ করেছে। এতে কিছুটা পরিবর্তন হলেও মূলভাবের কোন ব্যতিক্রম হয়না। প্রাচীন কাল হতেই প্রবাদ সাহিত্যে স্থান লাভ করে এসেছে এবং প্রচারিত হয়েছে। ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে প্রথম ঋকবেদের মধ্যেই প্রবাদ ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায় ।[৪]

বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদে ও প্রবাদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।
ক. আপনা মাংসে হরিণা বৈরী।
খ. বলদ বিয়ালো গাভীআ বাঝে।
বড়ু চণ্ডীদাস ও কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কর্তৃক সাহিত্যিক প্রবাদ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

হরিণা জগৎ বৈরী আপনার মাংসে।
(মুকুন্দরাম)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ, মহাভারতেও প্রবাদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রবাদ জাতির অন্তরের পরিচয় বহন করে। একটি জাতির বুদ্ধিমত্তা, কর্মকুশলতা ও চিন্তাধারার পরিচয় মিলে তাদের প্রবাদ সাহিত্যে। প্রবাদ জনমনে প্রবেশ করার কুঞ্জিকা স্বরূপ।

জাতির মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি নির্ণয়েও প্রবাদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ইংরেজ পাদ্রীরাই প্রথম প্রবাদ সংগ্রহে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এদেশের শতকরা ৮০% লোক গ্রাম্য জীবনযাপন করে। তাদের প্রতিটি কার্যে দৈনন্দিন অবসর বিনোদনে, প্রিয় আলাপনে, নীতিচর্চায়, আচারে, বিচারে, ধর্মে, কর্মে, দানে, গ্রহণে, শাসনে-প্রশাসনে, বাদানুবাদে, আহারে-বিহারে যাবতীয় ব্যাপারে প্রবাদের অপরিসীম প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[৫]

লিখিত সাহিত্যের বহু পূর্বেই প্রবাদ রত্নগুলো ভাষা-জননীর অঙ্গে অলংকার রূপে ফুটে উঠেছিল। লিখিত সাহিত্যে প্রবাদ স্থায়িত্ব লাভ করেছে। প্রবাদ ভাষাকে পল্লবিত করতে অর্থাৎ অল্প কথায় অধিক তত্ত্ব বুঝাতে সহায়ক। বাস্তবিকই প্রবাদগুলো ভাষা সুন্দরীর কণ্ঠে অলক তিলকের ন্যায় শোভা পায়। প্রবাদের মৌখিক ধারাটি কালক্রমে ভাষার দিক থেকে আধুনিককৃত হয়েছে, কিন্তু মূল ভাবের কোন ব্যতিক্রম হয়নি।

বৃহত্তর ফরিদপুরের বিভিন্ন জেলার মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনের আলাপ-চারিতায় প্রবাদ ব্যবহার করে থাকে। গ্রামের নিভৃত অঞ্চলের নিরক্ষর লোকেরাও কথা প্রসঙ্গে সুদক্ষ বক্তার মত আলাপ-আলোচনায় প্রবাদ ব্যবহার করে থাকে।

বিপরীতমুখী মনোভাব, পরস্পর বিরোধী আদর্শ, সম্পর্ক ভিন্নধর্মী ও ভিন্নজাতীয় জিনিস বা ব্যক্তির মধ্যে সুষ্ঠু মিলন গড়ে উঠতে পারে না। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত প্রবাদটি ফরিদপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়ে থাকেঃ

এক গাছের বাকল আরেক গাছে না লাগে
আডা দিয়া লাগাইলে চডা দিয়া উডে।

(মাদারীপুর)

বাস্তব জীবনে কর্মকুশলতা ও সৌন্দর্যশীলতাই সত্যিকার গৃহস্থের পরিচয় বহন করে নিম্নোক্ত প্রবাদটিঃ

সাজলে গোজলে বিডী,
লেপলে পোছলে মাডি।

(শরীয়তপুর)

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক প্রেক্ষাপটে ও প্রয়োজনের তাগিদে নিকট আত্মীয় অপেক্ষা অনাত্মীয় বেশী গুরুত্ব পেলে নিম্নোক্ত প্রবাদটি বলা হয়,

আপনা হাসুরী[১] ছেলাম পায়না,
[১]মামী হাসুরী ডোয়া[২] পায়।

(গোপালগঞ্জ)

কথান্তরঃ

আপনা হাউরীর খবর নাই
মামী হাউরী আউকা দেয়।

(মাদারীপুর)

সমাজে এক শ্রেণীর মানুষ আছে নিজেরা দুর্নীতির মধ্যে ডুবে থেকেও অন্যকে দুর্নীতিবাজ বলে প্রতিপন্ন করতে দ্বিধা করেনা। এই ধরনের লোকদের প্রতি কটাক্ষ করে নিম্নোক্ত প্রবাদ ব্যবহার করা হয়ে থাকেঃ

চোরের মার বড় গলা
নিত্যি খায় দুধ কলা।

(রাজবাড়ী)

বন্ধুবেশী দুষ্ট প্রকৃতির একজন আরেক জনের ক্ষতি সাধন করা মুনাফিকের পরিচায়ক। কিছু দুষ্ট লোক আছে বন্ধুবেশে কথা-বার্তার ভিতর দিয়ে একজন আরেক জনের গোপন কথা জেনে নিয়ে তাকেই শেষে আঘাত করেঃ

দুষ্ট লোকের মিষ্ট কতা, খাইয়া বসে কাছে,
কথা দিয়া কথা নেয় প্রাণে মারে শেষে।

(মাদারীপুর)

ভিতরে অন্তঃসারশূন্যতা ও বাহ্যিক আড়ম্বরতার প্রতি কটাক্ষ করে নিম্নোক্ত প্রবাদটি বৃহত্তর ফরিদপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়ে থাকেঃ

ঘরে নাই ঘটি বাটি
কোমরে খেলাই চাবিকাঠি।

(গোপালগঞ্জ)

নিম্নোক্ত প্রবাদে সমাজের বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষের চিত্র ও নিকৃষ্ট স্বভাবের লোকেরা নিকৃষ্ট স্বভাবের লোকের সান্নিধ্য পছন্দ করে তা প্রকাশিত হয়েছেঃ

(১)

চোরে চোরে আলি
এক চোরে বিয়া করে
আরেক চোরের হালি[৩]। (ফরিদপুর)

১। হাসুরী < শাশুড়ী > সাসুড়ী > সাসুরি > হাসুরি
২। ডোয়া ← ডোআ = ঘরের চারপাশের বাড়তি মাটি দিয়ে সুন্দর করে লেপা জায়গা।
৩। হালি < শালী < শ্যালিকা = স্ত্রীর ছোট বোন ।

Dhaka University Institutional Repository

(২)

ঝড়ে বগ মরে,
ফকিরের কেরামতি বাড়ে।

(মাদারীপুর)

স্বৈরাচারী শাসকদের দাপট ও উৎপাতের ঈঙ্গিত পাওয়া যায় নিম্নোক্ত প্রবাদেঃ সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে।

(১)

বাঘে মইষে লড়াই বাধায়
নল খাগড়ার পরান যায়।

(মাদারীপুর)

কথান্তরঃ

(২)

রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধায়
উলু খাগড়ার পরাণ যায়।

(শরীয়তপুর)

আত্মমুখী চেতনা প্রকাশিত হয়েছে কিছু কিছু প্রবাদে,

চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।
আপনা বালো তো জগত বালো।

দুশ্চরিত্রাদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত প্রবাদে কটাক্ষ করা হয়েছেঃ

ঘোচে নাই যার কামের গন্ধ
ভাতার[১] মরলে যার হয় আনন্দ।

(মাদারীপুর)

প্রবাদের গঠন আকার প্রকার ও অর্থগত বৈশিষ্ট্যে থাকে লোক-মনের শৃঙ্খলা ও পরিমিতি বোধের পরিচয়। প্রবাদে যুক্তিবাদ, দার্শনিক মতবাদ, বিজ্ঞান মনস্কতা, ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়।[৬]

নিরক্ষর সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে লেখক, শিক্ষক, ধর্মযাজক, সকলের মধ্যেই প্রবাদের প্রায়োগিক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। নিম্নোক্ত প্রবাদে বাস্তব জীবনদর্শনের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

উদাহরণঃ

১। ভাতার = ভাত + অর = ভাতার = স্বামী

Dhaka University Institutional Repository

(১)

ছাগল মরে ত্যালে
মানুষ মরে ম্যালে[১]।

(গোপালগঞ্জ)

(২)

দধি দুগ্ধ করিয়া ভোগ,
ঔষধ দিয়া খন্ডাব রোগ।
আপনি মইলে কিসের আর
বলে ডাক, এই সংসার।

(মাদারীপুর)

বাংলা লোকসাহিত্যের প্রবাদের সাথে মাটি, মানুষ ও প্রকৃতির সাথে নিবিড় সম্পর্ক যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে সমাজের নানা স্তরের মানুষের জীবনযাত্রা, সংস্কার, বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও জাতিতত্ত্বের পরিচয় ।[৭]

উদাহরণঃ

বাপ রাজায় হব রাজার ঝি,
বাই রাজায় আমার তাতে কি?
স্বামী রাজায় হব রাজরানী।

(গোপালগঞ্জ)

প্রবাদে উপমা, চিত্রকল্পের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের মাধ্যমেও মানুষ, সমাজজীবন, সংস্কার, রীতি-নীতিকে বুঝানো হয়ে থাকে।

কলায় দলা, হলুদে ছাই,
বউয়েরে আদরিলে পোলারে পাই।

(শরীয়তপুর)

কলা গাছের গোড়ায় বেশী (দলা) মাটির ঢেলা দিলে এবং হলুদ গাছের গোড়ায় ছাই দিলে ভাল ফলন হয় তেমনি ছেলের বউকে ভালবাসলেই ছেলের মন পাওয়া যায়। উপরোক্ত প্রবাদটিতে চমৎকার উপমার সাহায্যে আমাদের সমাজজীবনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।[৩]

১। ম্যালে = < মেল = দলে / সাথী ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা ঃ

১. হানিফ পাঠান - বাংলা প্রবাদ পরিচিতি, বাংলা একাডেমী ১৯৭৬, পৃ. ১-৩ ।

২. আব্দুল খালেক - মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লৌকিক উপাদান, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ. - ৩৫১ ।

৩. খালেদ মাসুকে রসুল - নোয়াখালীর লোকসাহিত্যে লোকজীবনের পরিচয়, বাংলা একাডেমী, ১৯৯২, পৃ. - ৩৩ ।

৪. মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক-উপাদান, পৃ. - ৩৬৪ ।

৫. আশরাফ সিদ্দিকী - লোকসাহিত্য, ঢাকা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৩, পৃ. - ২৫৭।

৬. ওয়াকিল আহমদ, -বাংলা লোকসাহিত্য. প্রবাদ-প্রবচন, ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. - ১১ ।

৭. ঐ, পৃ. - ১৪ ।

৮. কাজী দীন মোহাম্মদ, লোকসাহিত্যে ধাঁধা, ও প্রবাদ, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮, পৃ. - ২৫

Dhaka University Institutional Repository

লোককাহিনী

আধুনিক কথা সাহিত্যের প্রাচীনতম উৎস প্রাচীন কালের কিস্‌সা-কাহিনী অর্থাৎ লোক-কাহিনী । মানুষের গল্প শুনবার আগ্রহ অত্যন্ত প্রাচীন । আর গল্প বলা ও শোনার মধ্য দিয়েই জন্ম হয়েছে বিভিন্ন লোক-কাহিনীর, লোক-কাহিনী থেকেই কথা সাহিত্য অর্থাৎ উপন্যাস, ছোট গল্পের উদ্ভব । সাহিত্যের লিখিত ধারার পূর্বে, লিপি আবিষ্কারের পূর্বে সুদীর্ঘ কাল মৌখিক সাহিত্য থেকেই মানুষ রসাস্বাদন করত, আনন্দ লাভ করত । লোক সাহিত্যে মৌখিক গল্প বলা বা লোক-কাহিনী বিরাট স্থান দখল করে আছে । লোক গল্প বা লোক-কাহিনীর প্রচলন পৃথিবীর সবদেশেই বিদ্যমান ছিল ।[১]

লোককাহিনীর বৈশিষ্ট্য হল হাজার বছর ধরে শ্রুতির মাধ্যমে একদেশ থেকে অন্য দেশে পরিভ্রমণ করে । উদারহরণ স্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশের কলাবতীর কন্যার গল্পটি বিখ্যাত "Cinderella" গল্পের পাঠভেদ । 'পঞ্চতন্ত্রের' গল্পগুলো ইউরোপের প্রায় সব দেশেই প্রচলিত । তাই লোক-কাহিনীকে বিশ্ব সংস্কৃতির একটি মূল্যবান অংশ বলা যায়।[২]

লোককাহিনীতে নর-নারীর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, মিলন-বিরহ, হাসি, কান্না, প্রেম, বিরহ বিরাজমান । কাহিনীগুলোতে হিংসা, বিদ্বেষ, মোহ, মিথ্যাচার, ক্রোধ, লালসা, শঠতা, বিশ্বাসঘাতকতার পাশেই রয়েছে ভালবাসা, সহিষ্ণুতা, উদারতা, ত্যাগ, দয়া এবং বিশ্বাসের মাধুর্য । ভালো-মন্দে মিলে যে মানুষ, তারই বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয় লোক-কাহিনীতে । তবে লোক-কাহিনীতে অলৌকিকতার স্থান বেশী । অলৌকিকতা ও কল্পনা দিয়ে লোক-কাহিনীতে অসম্ভবকে সম্ভব করা হয় ।

প্রাচীনকালে যেমন ঋকবেদের পুরাণ কাহিনীতে, তেমনি মধ্যযুগে শাহনামা, আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা, আনতারা অথবা হাতেম তাইয়ের গল্পে মানুষ অন্তরের রস পিপাসা মিটিয়েছে । গ্রীসের মাহাকাব্য ইলিয়াড ওডিসি, ভারত উপমহাদেশের রামায়ণ ও মহাভারত এবং রাশিয়ার প্রিন্স ইগোর কাহিনীমালা লোকের মন জয় করেছে । লিখিত ও অলিখিত ভাবে যুগ যুগ ধরে পুরুষ পরম্পরা ক্রমে গদ্যে বিধৃত কাহিনী পরিবেশিত হয়ে আসছে ।

বৈচিত্রের দিক দিয়ে লোক-কাহিনীর মধ্যে প্রকার ভেদ নিম্নরূপ ঃ

১। রোমাঞ্চকর কাহিনী ২। বীর কাহিনী ৩। স্থানিক কাহিনী ৪। পুরাণ কাহিনী ৫। জীব-জানোয়ারের কাহিনী ৬। নীতি কাহিনী ৭। হাস্য-রস্যাত্মক কাহিনী ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা লোক-কাহিনীর প্রথম সংগ্রাহক হিসেবে ডেল্টন ও ডামান্ট এর নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে । রেভারেন্ড লালবিহারী দে Folk tales of Bengal (লন্ডন, ১৮৮৫ সালে একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন)- এর পর জর্জ গ্রীয়াসসন ও উইলিয়াম ম্যাক কুলোকের বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোক-কাহিনী সংগ্রহ করেন ।

বৃহত্তর ফরিদপুরের লোক-কাহিনীর মধ্যে চন্দ্রবানুর কিসসা, হারমন ডাকাতের কিসসা, মৃগ পরীর কিসসা, বকবকির কিসসা, বেদের মেয়ে, মধুমালা, জামাল কামাল, গৌরচাঁদ মাঝি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । উল্লেখ্য যে ফরিদপুরের সর্বজনবিদিত জসীম উদ্দীন তাঁর বেদের মেয়ে ও মধুমালাকে ফরিদপুরের বাইরে সকল বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে প্রিয় করে তুলেছেন ।

কিংবদন্তী

আমাদের অতি পরিচিত সমাজ জীবনের সন্নিহিত কোন ঘটনার সত্য ও কল্পনা মিশ্রিত হয়ে কিংবদন্তীর রূপ নেয় । কিংবদন্তীর রাজ্য সম্পূর্ণ সত্য নয়, আবার সবৈব মিথ্যা ও নয় । সত্য ও কল্পনা; বাস্তব ও অতিপ্রাকৃত, মানুষের ইচ্ছা ও অনুভূতির সমন্বয় জনমনের ওপর দিয়ে অনবরত আন্দোলিত হতে হতে কিংবদন্তী গড়ে ওঠে । কিংবদন্তী হলো অর্ধেক ইতিহাস ও অর্ধেক কল্পনা । ঐতিহাসিক অথবা প্রাকৃতিক কোন বাস্তব নিদর্শনকে আশ্রয় করে যে কাহিনী জনমনে কল্পনার রূপ নেয় তাই যথার্থ কিংবদন্তী । পুকুর, পুরাতন অট্টালিকা, বটগাছ, নদী, মানবীয় প্রেম, ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্র সংযুক্ত হয়ে কিংবদন্তী নির্মিত হয় । পরিবেশ প্রকৃতির কারণে একেক অঞ্চলের কিংবদন্তীগুলো একেক রকমের হয় । কিংবদন্তীর মধ্যে দিয়ে সে দেশের মানুষের মনোজগত, সমাজ, সংস্কৃতিকে অনুভব করা যায় । বৃহত্তর ফরিদপুরের বিভিন্ন জেলায় যে সকল কিংবদন্তী রয়েছে তার মধ্যে 'শ্রী রাম খাঁর দীঘি' (গোপালগঞ্জ) 'পিঠা বাড়ী মৌজা', (গোপালগঞ্জ), 'ভাঙ্গা থানা' (ফরিদপুর), 'সেনাপতির দীঘি' (মাদারীপুর) উল্লেখযোগ্য ।

তথ্য নির্দেশিকা ঃ

১. আব্দুল হাফিজ, লোককাহিনীর দিক-দিগন্ত, আইডিয়াল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৩৭৯, রাজশাহী, পৃ. ১১-২১

২. আশরাফ সিদ্দিকী- লোকসাহিত্য, ১৯৮৫, পৃ. - ১০৩ ।

৩. মজহারুল ইসলাম- ফোকলোর পরিচিতি ও লোকসাহিত্যের পঠন পাঠন, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. - ৫৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সংস্কৃতি মূলত লোকসংস্কৃতি। এই লোকসংস্কৃতির একটি বিশাল অংশ জুড়ে আছে আমাদের বিপুল, সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী লোকসংগীত। হাজার হাজার বছর ধরে এই সংগীত একদিকে যেমন গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষকে আনন্দ দিয়ে আসছে তেমনি অন্যদিকে বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের ভাঙ্গাগড়া ও টানাপোড়েনের ক্ষেত্রেও লোকসংগীত এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশিষ্টতা তার লোকসংগীতের বৈচিত্র্যে বৈভবে ও অনন্যতায়। দারিদ্র্যের কষাঘাত, ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিবর্তন, যান্ত্রিক সংস্কৃতির তথা চলচ্চিত্র, দুরদর্শন, ডিস এন্টিনার সর্বগ্রাসী আকর্ষণে লোকসংগীতের অনেক ধারা বিলুপ্ত-বিস্মৃতির দ্বার প্রান্তে উপনীত। আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের প্রবল ঝঞ্চাঘাত উপেক্ষা করে আজও লোকসংগীতের অনেকগুলো ধারা সরস সজীবতায় দেদীপ্যমান রয়েছে। জারি, সারি, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, মারফতী, মুর্শিদী, বাউল, গম্ভীরা, আলকাপ, ঘাটু, বারমাসি, ধুয়া, পটুয়া, তরজা, বিচার, পালা, মালসী, কবিগান, কীর্তন, মেয়েলীগীত, মাইজ ভান্ডারী, গাজীর গান, গাজনের গান, নৌকা বাইচের গান, ছাদ পেটানোর গান ছাড়াও আরো অসংখ্য গান বাংলার লোকজীবনের কর্মে-অবসরে, উৎসবে, অনুষ্ঠানে গীত হয়ে থাকে।[১]

লোকসংগীত কখন কার কণ্ঠে প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল বা আদি রচয়িতা কে তা জানা নেই। কারণ লোকসংগীতের সৃষ্টি, ব্যাপ্তি, প্রচার, প্রসার, সবই ঘটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিবেশিত হয় কখনো একক, কখনো আপন পরিবার বা সমাজ বেষ্টনীর সীমাবদ্ধ অঙ্গনে। কথার অনির্বচনীতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের অনন্যতায় তা কখনো হয়তো সমাজের গন্ডী অতিক্রম করে বৃহত্তর অঞ্চল কখনো বা অঞ্চল পেরিয়ে উপনীত হয় সমগ্র দেশের মানসপটে।[২]

লোকসংগীতের সকল ধারা একই কালের বা একই জনপদের সৃষ্ট নয়। অধিকাংশ সংগীতের উদ্ভব, এমনকি প্রচার প্রসার অঞ্চল বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। লোকসংগীতের এই আঞ্চলিক বিশিষ্টতার পশ্চাতে রয়েছে ভৌগোলিক পরিবেশ ও জীবনজীবিকার স্বাতন্ত্র্য। লোকসংগীতের একেকটি ধারা একেক অঞ্চলে রচিত, প্রচলিত ও প্রসার লাভ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

লোকসংগীতের বৈচিত্র্যের ধারা ক্রমশ লোপ পাচ্ছে এবং বদলে যাচ্ছে তার আদিরূপ । একদিন এদেশের মানুষের গোলায় ধান ছিল, গলায় গান ছিল। সন্ধ্যার অবসরে গ্রামের লোক কুপি বা হ্যাজাক জালিয়ে সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে কবিগান, বাউল গান, গাজীর গান, গম্ভীরা, কীর্তন, পরিবেশন করত এবং রাতের ঘুম নষ্ট করে হাজার হাজার পল্লী শ্রোতা এই গানের রস উপভোগ করত। এই সব গানের তত্ত্বকথা, দর্শন, মাধুর্য ও সুরের ঝংকার একদিন হয়ত হারিয়েই যাবে যদি যথাযথ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ না করা হয়।

বিষয় বৈচিত্র্যে ও রসমাধুর্যে বাংলার লোকসংগীতের ভূমিকা অনন্য। প্রতিটি গীতের প্রতিটি বাক্যেই আছে রসময় আবেদন। লোকসংগীতের সহজ সরল প্রকাশ মনকে নিয়ে যায় রূপ থেকে অরূপে, এ গান জাগতিক প্রেম দিয়ে শুরু হয়ে মুহূর্তে নিয়ে যায় অমর্ত্যলোকে। সুর ও ছন্দ মাধুর্য এই গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দোতারা, বাঁশী, একতারা, মন্দিরা, বেহালা, কাঁসর সহযোগে গীত লোকসংগীত মানুষকে নিয়ে যায় অন্যলোকে । লোক কবির অধ্যাত্মবাদ ও মরমীবাদ সাধারণ শ্রেণীর মানুষকে করে মনুষত্বের দীক্ষায় দীক্ষিত।[৩]

বৃহত্তর ফরিদপুরের বিভিন্ন জেলায় লোকসংগীতের বিভিন্ন উপাত্ত ছড়িয়ে আছে। গ্রামের সাধারণ মানুষ সারাদিনের কাজের শেষে সন্ধ্যার অবসরে জারীগান, কবিগান, কীর্তন, যাত্রা, পালাগান উপভোগ করে। মেয়েলী গীত, সারীগান, মুর্শিদাগান, পাল্কীর গান ফরিদপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত। এইসব গানে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, প্রেম, বিরহ, আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনা, আঞ্চলিক সংস্কৃতি প্রকাশিত হয়ে থাকে।

বাংলা লোকসাহিত্যে মেয়েলী গীত একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে, পল্লীর নারী জীবনের ব্যবহারিক আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে মেয়েলী গীত সৃষ্টি হয়ে থাকে। মেয়ে মহলে প্রচলিত মেয়েলী গীতিগুলো সামাজিক ও পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠানে গীত হয়ে থাকে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল পরিবারেই এই গীতের প্রচলন রয়েছে।

বিবাহ পূর্বে পানচিনি, গায়ে হলুদ, মেন্দি দেয়া, স্নান করানো, পান সাজানো, বর সাজানো প্রভৃতি অনুষ্ঠানে গীত গাওয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহ কালীন সময়ে বর-বরণ, শা-নজর, মালা-বদল, কনে বিদায়ের সময়ে গীত গাওয়া হয়। বিবাহোত্তর অনুষ্ঠানের মধ্যে বধূবরণ, পাশাখেলা, বাসর জাগা, বাসি গোছল, মেলানী প্রভৃতিতে গীত গাওয়া হয়।

বিয়েতে গীত গাওয়া আবহমান গ্রাম বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য। বিয়ের সময় গ্রামের মেয়েরা কয়েকজন একত্র হয়ে বিয়ের পয়গাম থেকে শুরু করে বরের বাড়ীর লোকজনদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে বিভিন্ন গীত এবং বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হওয়া পর্যন্ত গীত গেয়ে থাকে। এই গীত শুধুমাত্র অনন্দ উপভোগের জন্যই নয়, এতে গ্রামীণ জীবন, সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য প্রকাশিত হয়ে থাকে। হলুদ মেন্দি বাটার মধ্যে দিয়েও মেয়েকে শ্বশুর বাড়ীর মুরুব্বীর প্রতি আদব-কায়দা পালনের প্রতি সচেতন করে দেয়া হচ্ছে নিম্নোক্ত গীতটিতে ঃ

হলুদ বাটো মেন্দী বাটোরে
ও ময়না বাটো জলদি কইর‍্যারে
হলুদ বাটো মেন্দী বাটোরে ।
ও গুণের ময়না বাটো জলদি কইর‍্যারে।
তোমার শ্বশুর আব্বায় আইলে
ও ময়না হাজার ছালাম দিবারে ।
হলুদ বাটো মেন্দী বাটোরে
ও ময়না বাটো জলদি কইর‍্যারে ।
তোমার শাশুড়ী আম্মায় আইলে
ও ময়না ওজুর পানি দিবারে,
হলুদ বাটো মেন্দী বাটোরে
ও ময়না বাটো জলদি কইর‍্যারে ।
তোমার ভাসুরে[১] আইলে
ও ময়না ফুল বিছানা লাছবারে[২]।
(শরীয়তপুর)

বিয়ের পর মেয়েদের স্বামীর বাড়ীই হয় আসল ঠিকানা। বড় ঘরের মেয়ের যদি দরিদ্র পরিবারের ছেলের সাথে বিয়ে হয় তাহলে অর্থকষ্ট ও মনোকষ্ট দুই তাকে পীড়া দেয়। কারণ মেয়েরা ব্যক্তিগতভাবে অর্থনৈতিক স্বনির্ভর না হওয়াই এর মূল কারণ। তবুও বধূ হিসেবে মেয়েটি বাপের বাড়ীর তুলনায় স্বামীর বাড়ীই বেশী আপন করে নেয়, এবং স্বামীর যা আছে তাতেই সে সন্তুষ্ট থাকে।

বাপের বাড়ীর দালান কোঠা না হইয়াছেরে আপন
পরের বাড়ীর খেরের ঘরওরে হইয়াছে আপন।
আমি কার বা নাইওরও আসিরে।
কইও কইও খবর কইও আমার বাবাজানের কাছে

১। ভাসুরে - স্বামীর বড় ভাই ।
২। লাছবারে - বিছিয়ে রাখা / পেতে রাখা ।

Dhaka University Institutional Repository

আমি কারবা নাইওর আসিরে।
বাপের বাড়ীর লেপ তোষকরে না হইয়াছে আপন
পরের বাড়ীর দোতরা[১] খাতারে হইয়াছে আপন ।
এই ছিল আমার কপালেরে
কইও কইও খবর আমার মা জননীর কাছে।
আমি কারবা নাইওর ও আসিরে
বাপের বাড়ীর খাট ও পালংরে না হইয়াছে আপন।
পরের বাড়ীর মাটি ও সপের বিছানা হইয়াছে আপন।
উইরা যাওরে পশু পংক্ষী উইরা যাওরে
কইও কইও খবর আমার ভাইজানেরও কাছে
আমি কারবা নাইওর আসিরে।

(গোপালগঞ্জ)

নব পরিণীতা বধূকে স্বামী নিজ দেশে নিয়ে যাত্রা করছে তাতে মায়ের সাশ্রুনেত্র প্রবোধ দিতেছেন :

টাকা নয় রে কড়ি নয় রে কোচায় রাখিব।
পরের লাইগ্যা হৈছে গৌরী পরেরে যে দিব।

অনাদিকে নদীপথে নৌকা ভেসে চলছে, গৌরী (কন্যাকে বুঝানো হয়েছে) মাঝিদের মিনতি করে বলছে :

ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা চলকে ওঠে পানি,
ধীরে ধীরে বাও রে মাঝি ভাই মায়ের কান্দন শুনি।
ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা চলকে ওঠে পানি,
ধীরে ধীরে বাও রে মাঝি ভাই ভাই বুনের কান্দন শুনি।[৪]

(ফরিদপুর)

মেয়েলী গীতে অশিক্ষিত সাধারণ গ্রাম্য নারীর মনের ভালবাসা, সুখ-দুখের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। গ্রামে স্ত্রীকে একা ফেলে স্বামী অর্থ উপার্জনের জন্য দূর দেশে যায়। এটা স্ত্রীর জন্য বেদনাদায়ক । তাই স্ত্রী সাংসারিক অর্থ জোগানে নিজের অলঙ্কার বিক্রি করতে প্রস্তুত কিন্তু স্বামী বিরহে একা থাকতে রাজী নয়, সেটি প্রকাশ পেয়েছে বৃহত্তর ফরিদপুরের মাদারীপুর জেলার নিম্নোক্ত গীতটিতে ঃ

দূরের চাকরীতে বন্ধু যাইও নারে
দূরের চাকরীতে বন্ধু যাইও নারে
আরো ৬ মাস খাওয়াইমু তোমারে
নাকের ডাসা বিক্রি করিয়া রে।
দূরের চাকরীতে বন্ধু যাইও নারে
দূরের চাকরীতে বন্ধু যাইও নারে
নাকের ডাসা বিক্রি করলে শাশুড়ী মন্দ বলবেরে ।
দূরের চাকরীতে বন্ধু না যাইও রে

Dhaka University Institutional Repository

দূরের চাকরীতে বন্ধু না যাইও রে
বর্ষার ৬ মাস খাওয়াইমু তোমারে
বর্ষার ৬ মাস খাওয়াইমু তোমারে
গলার হারও বিক্রি করিয়ারে ।
দূরের চাকরীতে বন্ধু না যাইও রে
দূরের চাকরীতে বন্ধু না যাইও রে ।।
(মাদারীপুর)

গ্রাম বাংলার সামাজিক পটভূমিতে মেয়েলী গীত লোকসাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। পল্লী রমণীর মুখে মুখে সৃষ্ট এই গীতিগুলি প্রধানত পল্লী নারীর আশা-আকাঙ্খা, আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার মধ্যে দিয়ে সমাজ ও পারিবারিক জীবনের রীতি প্রথা, অর্থনৈতিক অবস্থা, নারী মনের পরিচয় বিশেষভাবে উন্মোচিত হয়। মেয়েলী গীতের মধ্যে দিয়ে হাস্যরসের আনন্দ উপলব্ধি করা যায়। এর মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ মহিলারা নিজেদের প্রকাশ করার সুযোগ পায়। ফলে গ্রামীণ অশিক্ষিত নারী সমাজের মনোলোকের ভাবনা প্রতিফলিত হয়।

চির সংগ্রাম মুখর বৃহত্তর ফরিদপুরের মানুষ। প্রমত্তা পদ্মা, আড়িয়াল খাঁর তীব্র স্রোতে প্রতি বছর ভেসে যায় তাদের ঘর বাড়ি। কিন্তু তাতে কি? নদী ভাঙ্গা বিধ্বস্ত মানুষ নতুন চরে আবার গড়ে তুলছে তাদের বাড়ি ঘর।

নারী ঃ আড়িয়াল খাঁর ভাঙ্গলকূলে ধর বানাইলে বন্ধুরে
ভাইস্যা যাইব বাইষ্যা কাল আইলে
পু ঃ ডরাইওনা সোনার বন্ধু ঘর বাড়ি ভাইস্যা গেলে
বানাইমু আবার শীত কালে।
পু ঃ আমি কাটুমু ভিটার মাটি তুমি বানবা পিড়া
নারী ঃ তুমি দিবা চালের ছাউনি আমি বান্ধুম বেড়া
উভয় ঃ (নতুন চরে নতুন ঘরে) ২ থাকুম দুইজন মিলে
পু ঃ নানা জাতের গাছ-গাছালি লাগাইমু বাড়িতে
নারী ঃ দেখতে দেখতে বড় হইয়া যাইব দিনে রাইতে
পু ঃ ফলব কত ফল ফলাদি সব্জী ও তরকারী
নারী ঃ সারা বছর খাইমু আর বিলাইমু পরশী বাড়ি
উভয় ঃ (আইব কোলে সোনার চান এক) ২দয়াল আল্লায় দিলে

কাল বৈশাখীর ঝড় উঠেছে আড়িয়াল খাঁর নদীতে। মালামাল বোঝাই নৌকার মাঝিদের জানমাল বাঁচাবার প্রাণান্তে চেষ্টা। ভীত ও শঙ্কিত মাঝিদের মুখে শোনা যায় আল্লাহ-রছুলের নামের গান।

সাথীরা ঃ হেইয়া হো হেইয়া .....(৩বার)
ওরে ও.....মাঝি হে

Dhaka University Institutional Repository

হেই সালাম সালাম মাঝি সালাম
তুমি শক্ত করিয়া ধর হাল
দেখ উত্তর আকাশ ছাইয়া, বিজুলি চমকাইয়া
কাল বৈশাখী আসে ধাইয়া
বুঝি জগৎটা ফালাইবো খাইয়া
তাই সাথীরা ভয়ে বিহ্বল।

মাঝি ঃ ওরে ও ..... সাথী হে
দেখ ঝড়-বাতাসের সঙ্গে
উঠেছে তুফান গাঙ্গে
তারে কইরা উথাল পাথাল
তোরা খুইলা দড়াদড়ি, কইরা ধরাধরি
তাড়াতাড়ি গুটাও পাল
দাও জোরে টান দাঁড়ে, দেখ কাছে ধারে
আছে কিনা কোন খাল।

সাথীরা ঃ হায় আল্লাহ! ও আল্লাহ, এখন কি হইব
গরীবের নাও মোরা কেমনে বাঁচাইব,
কেমনে বাঁচাইব এই জানমাল

মাঝি ঃ ও তোরা ডরাইসনা কান্দিসনা, নাই ওরে ভয় নাই
এই গরীবের আল্লাহ সার তারে ডাক সবাই
আল্লায় বাঁচাইব এই গরীব ও কাঙ্গাল-
তোরা মুখে আল্লাহ রছুল-বল
তোরা মুখে আল্লাহ রছুল বল।

(মাদারীপুর)

কামার, কুমার, ছুতোর, জেলে, তাঁতী প্রভৃতি বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের পাশাপাশি বসবাস বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায়। তাদের জীবন জীবিকাও বৈচিত্র্যময়। কুমার দম্পতি মাটি দিয়ে গড়ছে হাড়ি-কলসি, খেলনা, ফুলের টব আরও কত কি? আর সেই সাথে নাচে গানেও মুখরিত করে তুলছে কুমার পাড়া।

নারী ঃ আয়রে কুমার
আয়রে আমার প্রাণের কুমার আয়রে মাটি লইয়া
বানাই মোরা হাড়ি কলসি যায়রে বেলা বইয়া।

পু ঃ (আয় কুমারী আমার সাথে, ছাইনা মাটি নরম হাতে)২
বানাইয়া খেলনা পুতুল দিবি রঙ লাগাইয়া

নারী ঃ মৌসুমী মেলায় যাইয়া
নগদ দামে বেইচা দিয়া

Dhaka University Institutional Repository

আমার লাইগা মালা চুড়ি আনবি তুই কিনিয়া।

পু ঃ আয় কুমারী
আয়রে আমার প্রাণ কুমারী আয়রে বানাই মোরা
ফুলের টব আর টালি সোরাই লোটা বাসন খোরা

নারী ঃ (রৌদে তারে শুকাইয়া
সারি সারি সাজাইয়া)২
পাকা পোক্ত করি পুইনের আগুনে পোড়াইয়া

পু ঃ বিকাল বেলা হাটে যাইয়া
নগদ দামে বেইচা দিয়া
তোর লাগিয়া ঢাকাই শাড়ি আনিব কিনিয়া, আয় কুমারী

নারী ঃ আয়রে কুমার, আয়রে প্রাণেরে কুমার আয়রে মাটি লইয়া
বানাই মোরা হাড়ি কলসি যায়রে বেলা বইয়া

পু ঃ আয় কুমারী

নারী ঃ আয়রে কুমার

পু ঃ আয়রে কুমারী

নারী ঃ আয়রে কুমার।

(ফরিদপুর)

আড়িয়াল খাঁর নদী ও এর নালা খালায় নৌকায় বসাবাস করে একটি যাযাবর সম্প্রদায় যারা সান্দার বাইদা নামে পরিচিত। এরা জাল ও বড়শী দিয়ে মাছ ধরে বিক্রি করে নদী তীরবর্তী হাট-বাজারে। এদের বউ-ঝিরা ঝাঁপি মাথায় চুড়ি, খেলনা, আলতা, সাবান বিক্রি করে বেড়ায় গ্রামে-গঞ্জে। অতি দরিদ্র এ মানুষগুলোর বৈচিত্র্যময় জীবনকাহিনী প্রকাশিত হয়েছে তাদেরই ভাষায়।

সমবেত ঃ মোরা সান্দার বাইদার দল, শুধু নাওখানি সম্বল
বড়শী বাইয়া জাল ফালাইয়া ধরি মাছ পোনা কেবল ।

পু ঃ মোগ বউ করে গাঁওয়াল - লইয়া কাংখে এক ছায়োল
(বেঁচে চুড়ি, আলতা, ফিতা)২ঝুনঝুনি আর মল

নারী ঃ মোগ ছুইটকা পোলা মাইয়া দুইডা পানতা ভাত খাইয়া
ডুবাডুবি কইরা ঘোলা করে গাঙ্গের জল

পু ঃ মোগ ডাঙ্গর মাইয়াডায় বইঠা টানে পায়ে পায়
(মাছ ধরিয়া বেইচা মোরা) ২ কিনি ডাইল আর চাউল ।

নারী ঃ মোগ জুয়ান ছাওলরা বেড়ায় ঘ্যা ফিরা
ফান পাতিয়া পংখী ধরে সারাদিন কেবল

পু ঃ গাঙ্গে ইঠলে ঝড় তুফান ডরে কান্দে পোলাপান
(গর বাড়ি নাই উঠব কোথায়)২ বল ভাই সকল।

(গোপালগঞ্জ)

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ে বাড়িতে অন্দর মহলে কনে সাজানোর সময় গান গাওয়া বৃহত্তর ফরিদপুরের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য। নিম্নোক্ত গানটিতে বৃহত্তর ফরিদপুরের সকল অঞ্চলেরই একের প্রতি অন্যের সম্প্রীতিবোধ, বিয়ে বাড়ির আনন্দ, সাজ-সজ্জা ও বিশেষ অলঙ্কার ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়।

আইজ কন্যা যাইব শশুর বাড়ি
আাইজ কন্যা যাইব জামাই বাড়ি
আইস কন্যার মাসি পিসি আইস পাড়াপরশী
কন্যারে সাজাইয়া দাও তোমরা সবাই বসি
বিয়ার নাচন নাচে খে ছুড়ির সাথে বুড়ি।
জামাই আনছে গয়না সাজানিও কত
কন্যারে সাজাইয়া দাও তোমরা মনের মত
দেইখা যেন ভাবে জামাই মানুষ নয় হুর পরী।
নাকে পরাও নোলক কানে পরাও কান পাশা
এত দিনে পূর্ণ হইল সবার মনের আসা
গলায় পরাও হাসুলি আর হাতে সোনার চুড়ি।
জামাই বাড়ি দেখতে কন্যায় আইব কত নারী
রূপ দেইখা তার মরবে সবাই হিংসায় জ্বইলা পুড়ি
নোনদেরা আক্ষেপে বলবে সইতে না পারি।

(ফরিদপুর)

বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে আজও গৃহস্থ বাড়ীর বৌ-ঝিরা ধানভানে সেই মান্ধাতার আমলের ঢেকিতে। ননদ ভাবী ও দাদী মিলে গভীর রাত পর্যন্ত ঢেকিতে ধান ভানে। আর গায় সয়লা গীত। নিম্নে উচ্চারিত হয়েছে তেমনই একটি দ্বৈত সংগীত।

ভাবী ও ননদ ঃ ও ধান ভানি রে ঢেকিতে পার দিয়া
ঢেকি নাচে আমি নাচি হেলিয়া দুলিয়া ---- ও ধান ভানিরে
ননদ ঃ ধান ভানিতে ভানিতে আইজ রাইত হইয়াছে মেলা
ঘরের মধ্যে মনের মানুষ ঘুমাইছে একেলা রে ঘুমাইছে একেলা
(এপাশ ওপাশ করে সে যে)২ গোস্বাতে ফুলিয়া----ও ধান ভানি রে
ভাবী ঃ ও ননদী ক্ষেপিস নারে একটু সবুর কর
মিষ্টি পানের খিলি খাওয়াই ভুলইমু তোর বর রে ভুলাইমু তোর বর
রসের পিঠা রাইখা দিছি ছিকাতে ঝুলাইয়া---ও ধান ভানি রে।
ভাবী ও ননদ ঃ ও রে দাদী লোডের গোড়ায় ঝিমাও কেন বইয়া
হাত চালাইয়া দাও রে তুমি খোলা আউলাইয়া
চাউল কাড়াইয়া যাইমু ঘরে কলসে তুলিয়া---ও ধান ভানি রে।

(রাজবাড়ী)

Dhaka University Institutional Repository

সারী অর্থ দল। নৌকা বাইচের উৎসবে মূল গায়েন ও সম্মিলিত দোহার কর্তৃক এ গান গীত হয়। শ্রাবণ মাস থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত ফরিদপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে নৌকা বাইচ হয়ে থাকে। এই নৌকা বাইচকে প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যই সারী গানের উদ্ভব। বাইচের সময় নৌকায় গতি আনার জন্য গায়েনরা তালে তালে সামনের দিকে ঝুঁকে বৈঠা টান দেয়। এতে নৌকা গতিবান হয়। নৌকা বাইচ জয়লাভের নিমিত্তে আনন্দ, উৎসাহ, উদ্দীপনা ও শক্তি সাহস-বর্ধনের জন্যই এ গান ঃ

তালে তালে ফ্যালাও বৈঠা নদীর উজান
আল্লা আল্লা বল সবে ঘন মারো টান।
নৌকার বুকে বাজে পানি,
ঢেউতে করে হানাহানি,
জোরে মারো টান ।
বাইয়্যা চলো মাঝি মাল্লা
মুখে বলো আল্লা আল্লা
সবাই মারো টান।

(ফরিদপুর)

বাউল ও মরমী সংগীত

বাউল ও মরমী কবি আধ্যাত্মিক সাধক। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে একই তন্ত্রের বন্ধনে সকলেই যেন আবদ্ধ। জীবাত্মারূপে পরমাত্মাকে ধরার ব্যাকুলতা এদের কথায়, গানে ও সাধনায় মনের মানুষ, অচিন পাখী, আলেখ সাঁই, দেলের সাঁই, বিমূর্ত সাঁই, ত্রিবেণীর ঘাট, আঠারো মোকাম, চৌদ্দ পোয়া, মণিপুর, দিলদরিয়া প্রভৃতি রূপক অভিব্যক্তির কল্পনায় অভিভূত সকল কবি ও মরমী সাধক।

ফরিদপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাউল কবি ও মরমী সাধকদের অসংখ্যা গান ছড়িয়ে রয়েছে। এ সব গানে শরীয়ত, মারেফত, গুরুবাদ, ভক্তিতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, পদাবলী প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত ঃ

সে যে চিন্ময় চৈতন্য স্বরূপ
চারগুণে এক দেহ তার
আইদা মানুষ সাদ্ধ্য কর যাব।
ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ুর জোরে

Dhaka University Institutional Repository

নিত্য নিলে ঘরে ঘরে,
চার দিয়া চার পুরণ করে
চার গুণে হয় এক আকার।
ঠিক যেন সে সর্বশক্তি
জীবের জীবন ভক্তের মুক্তি
যত দেখ প্রতিমূর্তি
এক জনার এই সব আকার
অধীন মেছের চান্দের কথা
ওদিকে তা জানবে কোথা
এক মানুষ জগতের দাতা
শরীক নাই সে একেশ্বর।
(ফরিদপুর)

মেছের চান্দ- মরমী কবি ও সাধক। তিনি মারেফত তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে গান রচনা করেন। তাঁর বাড়ি ফরিদপুরের মাসাউজান এলাকায়।

মুর্শিদা গান

ব্যক্তি মনের আধ্যাত্মিক চৈতন্যবোধ থেকে মুর্শিদা গানের উৎপত্তি। গূঢ়ার্থ, আঙ্গিক এবং তত্ত্বমূলক বস্তুনিরীক্ষে এ গান পরিবর্ধিত। সূক্ষ্ম সুফী মননশীলতায় উদ্বুদ্ধ মুর্শিদা গান। মুর্শিদ অর্থ গুরু, যিনি আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতা করেন। মুর্শিদ অলৌকিক শক্তির অধিকারী। মানবাত্মার কল্পচিত্রে ইনি আধ্যাত্মিক (Mystic) নির্দেশ দান করেন। ফরিদপুরের লোকজীবনে মুর্শিদা গানের প্রচলন প্রচুর।

দয়াল চাঁন বাণিজ্যেতে যায়
সোনার খড়ম রাঙ্গা পায়,
দয়াল চাঁন বাণিজ্যেতে যায়।
বনের বাঘে বৈঠা খায়
পানির কুম্ভীরে টানে গুণরে ।
বৈদেশী নাইয়া
আজ আমি জোয়ার পাইয়া
কোন বা দ্যাশে[১] চইল্যাছি বাইয়া
দয়াল চাঁন বাণিজ্যেতে যায়।
বালির চরে রাইন্ধ্যা খায়
জোরে ভাসাইয়া নিল হারে

Dhaka University Institutional Repository

বৈদেশী নাইয়া
আজ আমি জোয়ার পাইয়া,
কোন বা দ্যাশে যাই,
দয়াল চাঁন বাণিজ্যেতে যায়।
সোনার খড়ম রাঙ্গা পায়
দয়াল চাঁন বাণিজ্যেতে যায়।

(ফরিদপুর)

পাল্কীর গান

ফরিদপুরের লোকসাহিত্যে পাল্কীর গান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিয়ে বাড়ী থেকে শুরু করে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে নাইওর দেয়া-নেয়া এবং কোন কোন অঞ্চলে যাতায়াত করার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে পাল্কী ব্যবহার হয়। পাল্কী কাঁধে নিয়ে বেহারারা আপন মনে গান গাইতে গাইতে চলতে থাকে ঃ

বিদায় দেন বিদায় দেন হারে মাধন
বিদায় দেন আমারে রে ।
ওরে হাসি মুখে দিলে হারে বিদায়
মা ধন যাইতাম হাপন বাড়ীরে ।
বিদায় দেন বিদায় দেন হারে মাধন
বিদায় দিন আমারে।
বিদায় দেন বিদায় দেন হারে বাপজান
বিদায় দেন আমারে।
ওরে হাসি মুখে দিলে হারে বিদায়
যাইতাম আপন বাড়ী রে ।
বিদায় দেন বিদায় দিন হারে বাপজান,
বিদায় দেন আমারে।

(ফরিদপুর)

নব দম্পতিকে পাল্কী করে কনে বাড়ি থেকে বরের বাড়ি নেবার সময় পাল্কী বাহকেরা তাদের সুখময় দাম্পত্য জীবন কামনা করে তাদের গানের মধ্য দিয়ে।

Dhaka University Institutional Repository

তথা নির্দেশিকা ঃ

১. মোহাম্মদ আব্দুল জলীল, 'বাংলাদেশের লোকসংগীতঃ ভাটিয়ালি ও ভাওয়াইয়া', লোকসংস্কৃতি পত্রিকা, রাজশাহী । ১ম বর্ষ শ্রাবণ - পৌষ ১৪০২, পৃ. - ১ - ৫ ।

২. মুস্তফা জামান আব্বাসী- 'লোকসঙ্গীতের বিষয় বৈচিত্র্য' - লৌকিক বাংলা সম্পাদক, ওয়াকিল আহমদ, বাংলাদেশ ফোকলোর পরিষদ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৯৭, পৃ. - ২৪

৩. ঐ, পৃ. - ৩০

৪. সিরাজুদ্দিন কাসিমপুরী- বাংলাদেশের লোকসংগীত পরিচিতি, বাংলা একাডেমী ১৯৭৩, পৃ. ৭-১০

৫. মাসুদ রেজা- ফরিদপুরের লোকসাহিত্য, ফরিদপুর শিল্পকলা পরিষদ, পৃ. - ৫০

৬. ঐ, পৃ. ৭৭-৭৮

৭. ঐ, পৃ. ৯১-৯৩

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

লোকসাহিত্য একটি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক রূপরেখা নির্ণয় করে । সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা লোকসাহিত্য বহন করে । তাই লোকসাহিত্যকে একটি জাতির জীবন্ত ফসিল বলা যায় ।

লোকসাহিত্য এমনি একটি অরণ্য বৃক্ষ যার শিকড় অতীতের গভীরে প্রথিত থেকে শাখা প্রশাখা বিকশিত ও প্রসারিত হয় । কোন এক শতাব্দীতে সীমাবদ্ধ থাকে না, যে অংশের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়, শ্রুতিভ্রষ্ট ও বিশ্বাস সংস্কারচ্যুত হয়ে লোপ পেয়ে নতুনভাবে সংযোজিত হয়ে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়।

তাই লোকসাহিত্য অতীতের বিষয় হয়েও সমকালের; এর ক্রমবিকাশ আছে গতিশীলতা ও প্রবহমানতা আছে। আঙ্গিকে প্রাচীন হলেও লোকসাহিত্য ভাব দ্যোতনায় আধুনিক।

বাংলা লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বাংলা লোকসাহিত্যে হাজার বছরের বাঙালীর ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম, সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা লোকসাহিত্যের ধারায় বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চল লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোককাহিনী, লোকসংগীতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বৃহত্তর ফরিদপুরের লোকসাহিত্যের যে উপাত্তগুলো আলোচিত হয়েছে তাতে সাধারণ মানুষের জীবনের কথা, সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায়। বৃহত্তর ফরিদপুরের লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় গ্রাম বাংলার আঞ্চলিক সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মানব হৃদয়ের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা, প্রেম-বিরহের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ফলে ও চর্চার অভাবে এই অঞ্চলের লোকসাহিত্যের অনেক উপাদান হারিয়ে যাচ্ছে। তাই বৃহত্তর ফরিদপুরের লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে আলোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে সংগৃহীত মৌলিক উপাদানগুলো 'সংকলনে' প্রকাশ করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

সংকলন

Dhaka University Institutional Repository

শিশু বিষয়ক ছড়া

১। আয়রে চান নইড়া চইড়্যা,
টেংরা মাছের ঘারে চইড়্যা।
গাই দুয়ইয়া দুধ দিবো,
বারা বাইন্যাখুদ দিবো।
আয়রে চান আয় ।
খুকুর কপালে টিপ দিয়ে যা।

(ফরিদপুর)

২। তাই তাই তাই,
কুটি আতের মোয়া খাই ।
মোয়া নিলো শিয়ালে,
বুঝবানে কাইল বিয়ালে ।

(ফরিদপুর)

৩। ঘুঘু সই বাসা কই,
বানছি চাইডা ওদা ধান,
খুদ খাইলে তোর নরই আন ।
নরই ধইর‍্যা দিলাম টান।
বুড়িলো বুড়ি তোর
বড় তাল গাছটা নড়ে চড়ে
ছোড তাল গাছটা ভাইঙ্গা পড়ে
দুপ দুপ দুপ।

(শরীয়তপুর)

৪। বোষ্টমী লো দিদি
খোই বজি তোর গুদি
খোই আরো আলো
কাচ কলাডা খাগো
কলার বেতোর আটি
তালা তামুক গাটি।

(মাদারীপুর)

Dhaka University Institutional Repository

৫। গিননি শোগুন
কানে বাগুন
বাঁশতলা তোর ঘর
তুই কোনচি কাটিয়া মর
কোনচির আগায় দোড়া সাপ
বাপরে বাপ
ঙদোড়া সাপের কোড়া বিষ
বাদয়া আলি কোইয়া দিস।

(গোপালগঞ্জ)

৬। চেলিয়া যাও বুনিবাড়ী
বুনি খাওয়ায় পিঠা
খাজোর গুড় মিঠা ,
তেতোল অলো চুয়া
আমরা থাহি শুইয়া।

(মাদারীপুর)

৭। উৎতরেত্যা আলো বউ
জোড় গোনটা দেয়া
এ্যাককুলা পিটা খালাম
বাচুর বানদ্যা থুয়া
বাচুর বলে শালি
মাছ মারতি গ্যালি
দোড়া সাপে কামোড় দিলি ।
চিৎত্রোর ওইয়া পোলি
শোনি মোঙ্গোল বারে
এ্যাটটা তাবিজ বাধয়া দিস।

(শরীয়তপুর)

Dhaka University Institutional Repository

৮। চান্দের মার বুড়ি
ঘেচু তোলতে গেলি ।
সাত খান কাপুর পাইলি
সাত পুত্তুররে দিলি ।
নিজে পড়লি কলার খোল
কলা হইল বাতি
বেঙ্গে ধরল ছাতি ।
ছাতির উপর সরতা
জামাই হইল কর্তা ।
ছাতির উপর গামছা
দেখ জামাইর তামশা ।
ছাতির উপর বল্লা
ধর জামাইর কল্লা।

(গোপালগঞ্জ)

৯। এক তারা ভাই ঠডি বডি
দুই তারা ভাই বাগুন বডি ।
তারারা সতেক ভাই
তারা বাইন্দা ঘরে যাই ।
গরু মরে ঘাসে
মানুষ মরে ভাতে ।
আম গাছে ভাঙ্গা হরা
কালকে হবি ঠনঠনে খরা।

(মাদারীপুর)

১০। আমাগের মুনি ভাল
আম কুড়াতে গেল
আমি নাই কস ,
আমাগের মুনি ম্যাটিক পাস।

(রাজবাড়ী)

Dhaka University Institutional Repository

১১।আলো বিষ কালো বিষ
নন্দ রানীর পরামিশ ।
উত্তর পাড়া যাইস না
ভাজা পোড়া খাইসনা ।
আমি যে কবিরাজ
কারো কাছে কইসনা ।

(রাজবাড়ী)

খেলার ছড়া

১২। উত্তরে গেছিলাম
কইমাছ খাইছিলাম ।
কৈ মাছের তেলে
পেট আমার জ্বলে।

(মাদারীপুর)

১৩। ডুক্কু ডুক্কু কানাইয়া
নাও দিমু বানাইয়া
নাও যদি বাঁচে
বিয়া করমু পাছে।

(শরীয়তপুর)

১৪। ১ম দল ওয়া ওয়া
২য় '' কানদ কেন
১ম '' বাঘের ডরে
২য় '' বাঘ কই
১ম '' মাটির তলে
২য় '' মাটি কই
১ম '' ওই দুরে
২য় '' তোরা ক ভাই
১ম '' এক কুড়ি সাত ভাই
২য় '' এক ভাই দিবিনে
১ম '' ছুতে পারলে নিবিনে।

(মাদারীপুর)

Dhaka University Institutional Repository

১৫। এতি তলা বেতি তলা,
তা ধমকা ফুলের মালা ।
ফুলটি গেল ছুটে,
খেলাটি গেল মিটে।

(গোপালগঞ্জ)

১৬। ছি কুত কুত তাইয়া
বাবুলের মাইয়া
বাবুলে কান্দে
কচি কাঠাল খাইয়া।

(রাজবাড়ী)

১৭। উত্তরে গুম গুম
পশ্চিমে বান
পুটি মাছে ডিম পারে
পাহাড়ের সমান।

(ফরিদপুর)

১৮। বউচি খ্যালা ক্যামন খ্যালা,
দশ বারোডা মাইয়া পোলা।

(ফরিদপুর)

১৯। ছি কুত কুত তারে নারে,
কোকিল ডাকে বারে বারে।

(ফরিদপুর)

Dhaka University Institutional Repository

২০। আমতলা ঝামুর ঝুমুর
কাঠাল তলা বিয়া ।
ঐ আসতেছে নন্দের জামাই
সেওইর গামলা নিয়া,
ওসেওই খামুনা মেয়্যা বিয়া দিমুনা
মেয়্যার মাথায় লম্বা চুল ।
কোথায় পাব কুসুম ফুল ।
কুসুম ফুল ঝোলে ,
জামাই আইস্যা ডোলে ।
জামাইর ঘরে নুরা ধান ,
ঢেকুর ঢেকুর বাড়া বান ।

(ফরিদপুর)

২১।হলদি কুটা কুটা ,
জামাই বড় মোটা ।
আর হলদি কুটবোনা ,
মাইয়া বিয়া দিবনা ।
মাইয়া হইল দুধের সর ,
কানতে কানতে যায় পরের ঘর ।
পরের ব্যাটারা মারবি ,
কাঞ্চিত খাড়াইয়া কাঁদবি ।
কাঞ্চিত আছে ছিটকির ডাল ,
তাই দি তুলবি পিঠের ছাল ।

(রাজবাড়ী)

Dhaka University Institutional Repository

২২। আলতা আলতা তালপাতা,
বাবু গেছে কলিকাতা ।
আনতে কইছি সোনার চুরী,
আইন্যা বইছে রুপার চুরী ।
মাইয়া বিয়া দেবো না ।
মাইয়ার মাথায় কোকরা চুল,
বনেতে লাগে কুসুম ফুল।
কুসুম ফুলের গন্ধে,
জামাই আসে আনন্দে ।
খাওরে জামাই বাটার পান,
সুন্দরীরে করি দান ।

(গোপালগঞ্জ)

২৩।জামাই আইছে খামাইয়া,
ছাতি ধর টানাইয়া ।
ছাতির উপর বললা,
ধর জামাইর কল্লা ।
ছাতির উপর ভোমর,
ধর জামাইর কোমর ।

(মাদারীপুর)

২৪।উস্তা কুটলাম চাক চাক,
জামাই আইলো ঝাক ঝাক ।
জামাই আইছে বসপার দে,
থাল থুইয়া নাস্তা দে।
নাল মোড়গডা জবো দিয়া
জামাইর পাতে দে।
ধামা ধামা পিঠা বানাইয়া
জামাইর পাতে দে ।

(রাজবাড়ী)

Dhaka University Institutional Repository

২৫। নোটা আন ফোটা দেই,
কন্যা আন বিয়া দেই,
শিশু হলো ম্যায়া,
ব্যাতের আগা খ্যায়া।
জামাই আলো ঢুলতি ঢুলতি ,
সিদুর পরলো বায়্যা
আলো জামাই ঘামায়্যা ।
ছাতির উপর ভেসুরা
জোড় ঘোড়া কোমেলা ।
আমতলা জামতলা
জোড় পুতুলির বিয়্যা
কোমন দিয়া নিলো
চিলি ছোবল দিয়্যা ।

(শরীয়তপুর)

Dhaka University Institutional Repository

২৬। মুনি ঘুমালো পাড়া জুড়ালো
বর্গী এলো দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে।

(রাজবাড়ী)

২৭। লাউ কাটুনি শাক বাছনি শাশুড়ীরে,
নাইয়েরের তা নিতে আইছে দিবা নিকিরে।
আমি কি জানি বউ তোমার নাইয়ার আছে ?
জিজ্ঞাসা কর গিয়া তোমার ননদিনীর কাছে।
জ্বালা দেওয়ানি, নিম্পিরা দেওয়ানি নাদিনীরে
নাইয়ের তা নিতে আইছে দেবা নিকিরে,
আমি কি জানি ভাবী তোমার নাইয়ার আছে ?
জিজ্ঞাসা কর গিয়া তোমার দেওরের কাছে।
ওচ কোপানো, কোচ কোপানো দেওয়ারে
নাইয়ের তা নিতে আইছে দিবা নিকিরে।
আমি কি জানি গো তোমার নাইয়ার আছে ?
জিজ্ঞাসা কর গিয়া তোমার সোয়ামীর কাছে।

(মাদারীপুর)

২৮। ডলি বেগম পানের ডালা,
ভাত চড়ায়ে কোথায় গেলা।
শাশুড়ী কয় এ কোন জ্বালা,
ননদে কয় মাইয়া ফ্যালা।
ভাতারে কয় সর্বকিছু রাইট,
হে আমার লাখ টাকার মাইট।

(মাদারীপুর)

Dhaka University Institutional Repository

২৯। মান্দার গাছের আগায়রে,
দুলাল পাখি ডাকে রে,
আজ দেবনা ভানুরে,
কাল দেব না ভানুরে।
ভানুরে দেব সাজ্যায়া,
টাকা দেব বাজ্যায়া।
টাকার উপর তাগারি,
বউর বাপ বেপারী।

(ফরিদপুর)

৩০। মামা আইছে ঘামাইয়া,
ছাতি ধর টানাইয়া।
ছাতির উপর গামছা,
দেখ মামীর তামসা।
বড় মামী রান্দে বাড়ে,
ছোট মামী খায়।
মাইঝ্যা মামী গাল ফুলাইয়া
বাপের বাড়ী যায়।

(শরীয়তপুর)

৩১। মারলি ধরলি বাড়ীর বাতার
বাত না দিলি খাইতে,
উগাইর তলা জুতা থুইয়া,
পাও ধরাইমু বাইতে ।

(গোপালগঞ্জ)

Dhaka University Institutional Repository

ধাঁধা

অ

১। অনলে[১] জননী ত্যাজিল প্রাণ
পর্শিলে জননী পাইল জীবন।
(লবণ)
(মাদারীপুর)

২। অরণের ভিতর ফরং এর বাসা
ডিম পারিছে কাসা কাসা
এই পক্ষী তুই থাকতি ডিম
পাড়লো কোন পক্ষী ?
(কাঁঠাল ও তার রোয়া)
(রাজবাড়ী)

আ

৩। আইলো রে কালু খাঁ
বইল রে ডালে।
এমন যে কালু খাঁ
কে নড়াইতে পারে ?
(রাত)
(গোপালগঞ্জ)

৪।আগা ঝুন ঝুন গোড়া মুঠ্যা
যে না কতি পারবি তার বাপ ভুঠ্যা।
(ঝাড়ু)
(ফরিদপুর)

৫।আল্লায় দিছে করমু কি ?
বোডা নাই তার ধরমু কি ?
(ডিম)
(মাদারীপুর)

৬।আনতে গেলাম তোরে
ধইর‍্যা[১] বইলি মোরে
ছাইড়্যা দে মোরে
লইয়া যাই তোরে।
(বেত ফল ও কাঁটা)
(মাদারীপুর)

---

[১] ধইর‍্যা - ধর + ইয়া > ধইরা > ধইর‍্যা ।

Dhaka University Institutional Repository

৭।আল্লার কি রহমত
লাড়ির বিতরে শরবৎ।
(আখ)
(শরীয়তপুর)

৮।আছে ফল দ্যাশে নাই,
খাই ফলের চোচা[১] নাই।
(শীল)
(রাজবাড়ী)

৯।আইলো পাখি ঝন ঝনাইয়া
বইলো পাখি পাখ ছড়াইয়া।
(জাল)
(গোপালগঞ্জ)

১০। আন্ধার[২] ঘরে বান্দা নাচে
না করলে আরো নাচে।
(জিহ্বা)
(মাদারীপুর)

১১।আত নাই পাও নাই দ্যাশে দ্যাশে গোরে
তার অবাবে লোকে অনাহারে মরে।
(টাকা)
(শরীয়তপুর)

১২।আত আছে মাতা নাই,
দেহ আছে পরান নাই।
(জামা)
(মাদারীপুর)

১৩।আতল বিলে কাতল মাছ চৌদ্দ বিলে লতা
কোন খানে দেইক্যা আইছি ফলের আগায় পাতা।
(আনারস)
(মাদারীপুর)

১৪।আত আছে তার পাও নাই
পেট আছে তার উজুরী নাই।
(জামা)
(মাদারীপুর)

---

[১] চোচা - চোখ + আ > চোখা > চোচা ।

[২] আন্ধার - অন্ধকার > অন্ধয়ার > আন্ধার ।

Dhaka University Institutional Repository

১৫।আগায় খস খস
গোড়ায় মৌ
এই শ্লোক না ভাঙ্গতে পারলে
হে আমার বৌ।

(আখ)
(মাদারীপুর)

১৬।আকাশেতে টুমটুম বিমানে তার বাসা
আদারেতে ছাও খায় এ কোন তামাসা।

(বিড়াল ও চিল)
(মাদারীপুর)

১৭।আকাশ থেকে পড়ল হুক
হুক বলে আমার গুদ শুক।

(পাকা আম)
(রাজবাড়ী)

ই

১৮।ইল বিল শুকাইল চকের মধ্যে পানি রইল।

(তরমুজ)
(রাজবাড়ী)

১৯।ইল বিল শুকাইল গাছের আগায় পানি রইল।

(ডাব)
(মাদারীপুর)

২০।ইল বিল শুকাইল গাছের আগায় ক্যাদা রইল।

(তাল)
(গোপালগঞ্জ)

২১।ইল বিল শুকাইল গাছের আগায় পোনা রইল ।

(খেজুর)
(শরীয়তপুর)

২২।ইজল গাছে বিজল নাছে,কতা কইলে আরো নাচে।

(জিহবা)
(ফরিদপুর)

২৩। ইনি, বিনি, তিনি,
আমরা তিন বোনই
মাথায় বোঝা
পাছায় খোঁচা।

(চুলা)
(রাজবাড়ী)

Dhaka University Institutional Repository

উ

২৪। উপরে ঝাপি ঝুপি
নীচে কম্প বাঁশ
ফল হয়না ফুল হয় না
ধরে বার মাস।

(পান)
(মাদারীপুর)

২৫। উপর থন পড়ল ফোটা
ফোটার ভিতর লৌ,
এই শ্লোকটা না কইতে পারবে
হে ভবন দাসের বউ।

(জাম)
(গোপালগঞ্জ)

২৬। উপরে মাড়ি নীচে মাড়ি
তাইর মইধ্যে সুন্দরী বিউী।

(কাচা হলুদ)
(গোপালগঞ্জ)

২৭। উত্তরের তা আইলো বনিক
কতা কয় ঠমক ঠমক
খায় মাংস আগে ঘি
এই শ্লোকের মানে কি ?

(শকুন)
(মাদারীপুর)

২৮। উপরের থন পড়ল বুড়ি কাতা কাপুর লইয়া
হেই বুড়ি কতা কয় সবার মইধ্যে বইয়া।

(কোরান শরীফ)
(মাদারীপুর)

এ

২৯। একটু খানি মিডাই
ঘর ভইর‍্যা ছিডাই

(আলো)
(শরীয়তপুর)

Dhaka University Institutional Repository

৩০। একটু খানি আড়া[১]
ইচার গুড়ি বরা।

(লেবু)
(মাদারীপুর)

৩১। এই দেহি এই নাই
তারা বনে বাগ নাই।

(বিদ্যুৎ)
(গোপালগঞ্জ)

৩২। এক আত গাছটি
ফল ধরেছে পাঁচটি।

(হাত)
(মাদারীপুর)

৩৩। এতটুকু ছেলেটি
বুকে তার নুনুটি।

(বদনা)
(রাজবাড়ী)

৩৪। এক আইলে দুই ভাই
কারো সাথে দেখা নাই।

(চোখ)
(রাজবাড়ী)

৩৫। এই খান থেকে মারলাম থাল
থাল গেল বরিশাল।

(চিঠি)
(মাদারীপুর)

৩৬। এত গাছ টান দিলে
বেত গাছ লড়ে
কইঙ্কায় ডিম পারলে
গঙ্গায় ভাসে।

(ঘি)
(মাদারীপুর)

৩৭। এক আইলে দুই ভাই
কারো সাথে কারো দেখা নাই।

(চোখ)
(রাজবাড়ী)

[১] আড়া - আড় + আ = আড়া = ছোট গর্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

৩৮।এমন একটা দড়ি
না গুছাতে পারি।

(রাস্তা)
(শরীয়তপুর)

ক

৩৯। কান্দির উপর কান্দি
যে না কতি পারবি
হে আমার বান্দি।

(কলার মোচা)
(শরীয়তপুর)

৪০। কেরে বেটা হেটে যায় ?
আড়ে আড়ে ফিরে চায় ?
আমার বাবায় বিয়ে করেছে তোর বাবার মায়েরে

(ফুফু ও ভাতিজা)
(গোপালগঞ্জ)

খ

৪১। খড়িতে জরি জরি
ক্ষেতে তার বাস
ফুল নাই পাকড়া নাই
ধরে বারো মাস।

(পান)
(গোপালগঞ্জ)

গ

৪২। গৃহস্থের আতি, নিত্য খায় নাতি।

(ঢেকি)
(মাদারীপুর)

Dhaka University Institutional Repository

৪৩। গলা কাটলি ধলা রক্ত
রক্ত মণিহার।
এই শ্লোকটা যে কতি পারবি
বুদ্ধি আছে তার।
(পৈপৈ)
(রাজবাড়ী)

৪৪। গোল গাল দেহটা
পেটের ভিতর হাত পা,
চলে কিন্তু নড়ে না
এটা কি তা বল না।
(খড়ি)
(রাজবাড়ী)

৪৫। গলা আছে
তলা নাই,
কি এটা বলনা ভাই।
(পোলো)
(রাজবাড়ী)

ঘ

৪৬। ঘরের পাছের[১] গাই
এক বিয়ানে নাই।
(কলা গাছ)
(রাজবাড়ী)

৪৭। ঘর আছে দুয়ার নাই
মানুষ আছে কতা নাই।
(কবর)
(ফরিদপুর)

৪৮। ঘরের তলে ঘর
হের তলে পইর‍্যা মর।
(মশারী)
(মাদারীপুর)

[১] পাছের - পশ্চাৎ > পচ্চাৎ > পাছা + এর > পাছার > পাছের ।

Dhaka University Institutional Repository

৪৯। ঘরের পাছে কাঠের গাই
বছর বছর দুয়াই খাই।
(খেজুর গাছ)
(রাজবাড়ী)

চ

৫০। চল মামা চলে যাই
চলে গিয়ে লেবু খাই।
যে লেবুডার বোডা নাই।
(ডিম)
(ফরিদপুর)

৫১। চার কলসী মধু ভরা
ঢাকনা নাই তার উববুত করা।
(গাইর বান)
(মাদারীপুর)

৫২। চামড়ার বন্দুক বাতাসের গুলি
ছাইড়া দিলাম ফাঁকে
লাগল যাইয়া নাকে।
(পাদ)
(গোপালগঞ্জ)

৫৩। চাইরো পাশে কাটা কোটা
মধ্যি খানে সাহেব বেটা।
(আনারস)
(শরীয়তপুর)

৫৪। চোর নয় কিন্তু হয় সর্ব স্বার্থপর
রাক্ষস নয় কিন্তু শুষে শোণিত নিকর
স্বর্প নয় কিন্তু থাকে গর্তের ভিতর
ভূত নয় প্রেত নয় কিন্তু রাত্রিকালে চরে।
(মশা)
(মাদারীপুর)

Dhaka University Institutional Repository

ছ

৫৫। ছয় পায়ে আসে
চার পায়ে বসে
দুই পায়ে খসে।

(মশা)
(শরীয়তপুর)

৫৬। ছোড ছোড পোলাপান
দুধ বাত খায়
বড় বড় গাছের সাথে
যুদ্ধ করতে যায়।

(কুঠার)
(রাজবাড়ী)

৫৭। ছোট থাকতে ফেনদে শাড়ী
বড় হইলে উলঙ্গ।
বুড়া কালে জটা ধরি
ভিতরে তার সুরঙ্গ।

(বাঁশ)
(রাজবাড়ী)

জ

৫৮। জাগলে পরে খুলতি হয়।
শুইতে গেলে দিতি হয়।

(দরজা)
(গোপালগঞ্জ)

৫৯। জন্মে ধলা বয়সে কালা,
গলায় লোহার হার।
লম্ফ দিয়া শিকার করে।
কি নামটি তার ?

(ঝাকি জাল)
(ফরিদপুর)

Dhaka University Institutional Repository

৬০। জন্ম কালে রক্ত বর্ণ, চক্ষু শাড়ি, শাড়ি,
কৈলাশের শিব নয়, কিন্তু জটা ধরি,
মৎস নয়, মাংস নয় সর্বলোকে খায়,
কি নামটি তার, থাকে বা কোথায় ?
(আনারস)
(গোপালগঞ্জ)

ট

৬১। টিক্কা সোনা গায়,
পাকলে ঘ্রাণ কয়।
(বেল)
(ফরিদপুর)

ড

৬২। ডাকতে ডাকতে পেট অয়,
বিনা সন্তানে খালাস হয়।
(পোটকা মাছ)
(গোপালগঞ্জ)

ত

৬৩। তিন জীবের তেইস কান
শর্ত ভাঙ্গাইয়া পান খান।
শর্ত ভাঙ্গাইয়া না খাইলে পান,
কাটা যাবে তার কান।
(শামুক)
(মাদারীপুর)

৬৪। তারা বাপ পুত তারা বাপ পুত
তাল তলা দিয়া যায়,
একটি তাল পেল
সবাই ভাগ কইরি খেল।
(পিতা, পুত্র, নাতি)
(রাজবাড়ী)

Dhaka University Institutional Repository

৬৫। তুমি রইছ খালে, আমি রইছি ডালে,
তোমার সাথে আমার দেহা হয় মরন কালে।
(মাছ, মরিচ, তরকারী)
(ফরিদপুর)

থ

৬৬। থালা ভরা সুপারী, গোনতে পারে কোন ব্যাপারী ?
(তারা)
(মাদারীপুর)

৬৭। থাল ঝক মক থাল ঝক মক করে
বিন্যা ঝোরের আগুন কে নিবাইতে পারে ?
(রৌদ্র)
(রাজবাড়ী)

দ

৬৮। দশ জনে আনে ধরে,
দুই জন মারে,
বল কি কয় তারে ?
(উকুন)
(গোপালগঞ্জ)

৬৯। দশ শীর নয় বীর,
নয় সেরা বন
কাটিলে রুদির ধারা
বাহির নাহি হয়,
সুস্বাদ বলিয়া লোকে যত্ন করে খায়
কহে কবি কালি দাস, হেয়ালির ছালা,
পন্ডিতের বোঝা দায় মুর্খে বুঝে কলা।
(কলা)
(গোপালগঞ্জ)

৭০। দেইক্যা আইলাম খালের কান্দে
নিজের মাতা নিজে গেলে।
(কচ্ছপ)
(শরীয়তপুর)

Dhaka University Institutional Repository

৭১। দুই ঠ্যাং ধইর‍্যা
মইধ্যে দিলাম ভইর‍্যা।
(ছরতা)
(ফরিদপুর)

ন

৭২।নাই গাছ তার শুধু পাতা
মুখ নাই সে কয় কতা
বুদ্ধি নাই তার আপন ধরে
বুদ্ধি বিলায় যারে তারে।
(বই)
(শরীয়তপুর)

প

৭৩।প্যাট আছে তার মাতা নাই।
হাত আছে তার পাও নাই।
(জামা)
(শরীয়তপুর)

ব

৭৪। বাগানের থন আইলো তুইত্যা
বাতে দিল মুইত্যা।
(লেবু)
(মাদারীপুর)

৭৫। বছরে আসে মাসে যায়,
দিনে জোগার করে রাইতে খায়।
(রোযা)
(ফরিদপুর)

৭৬। বোটা শূণ্য গাছে ফলে,
সেই ফল খায় সকলে।
আটি নাই রসে ভরা,
এমনি ফল দেখছ কারা ?
(শীল)
(রাজবাড়ী)

Dhaka University Institutional Repository

৭৭। বাড়ীর পিছে ফলন্ত গাছ
ফল রাইখ্যা পাতা খাছ।
(পাটশাক)
(মাদারিপুর)

ম

৭৮। মাইড্যা আতুন কাঠের গাই
বছর বছর দুয়াই খাই।
(খেজুর গাছ)
(ফরিদপুর)

৭৯। মায়ের হয় না ভাই
তবুও মামা কই।
(চাঁদ)
(গোপালগঞ্জ)

৮০। মুখ দিয়া টলার চালায়
দুই হাত দিয়া ধরে
নাকে মুখে বেড়োয় ধুমা
বগল বগল করে।
(হুক্কা)
(গোপালগঞ্জ)

৮১। মাটির তলে পাঠির ছাও
তা কি তোমরা খাবার চাও ?
(ইন্দুর)
(রাজবাড়ী)

৮২। মানুষ খায়, গরু খায়, বাঘ ও তো না,
উড়ে উড়ে পেখম ধরে ময়ুর ও তো না।
(মশা)
(মাদারীপুর)

৮৩। মা রইছে নানীর প্যাডে[১]
আমি গেলাম বাবুর আডে ।
(কলা গাছ)
(ফরিদপুর)

[১] প্যাডে - পেট > প্যাট > প্যাড + এ = প্যাডে ।

Dhaka University Institutional Repository

৮৪। মরায় জ্যাতা গেলে

(চাই)

(মাদারীপুর)

৮৫। মাঠের পড়ে কাঠের গাই,
ছেদে বেধে তার দুধ খাই।
গাই জ্যান্ত বাছুর মরা,
সেই বাছুরের গলায় দড়া।
সেই তো মায়ের মাটির মেয়ে,
দুধ খাচ্ছি সাধ মিটিয়ে।

(খেজুর গাছ ও মাটির কলস)

(গোপালগঞ্জ)

হ

৮৬। হলুদ বরণ পাখিটি
খরগো বরণ পাও
কাঁটা বনে ভেচকি দিলে
কেডা কমনে যাও
বাবার শ্যালা কানতে
কানতে যাও।

(বল্লা)

(মাদারীপুর)

র

৮৭। রাঙ্গা মুরগী ডেঙ্গা ছাও
হাড় নাই তা চাবাই খাও।

(পিয়াজ)

(ফরিদপুর)

৮৮। রুটির একপিঠ ঐ
আর একপিঠ কই।

(জমি)

(গোপালগঞ্জ)

Dhaka University Institutional Repository

৮৯। রাজার বাড়ীর মেনা গাই, মিনমিনাইয়া যায়
হাজার টাকার মরিচ খাইয়া আরো খাইতে চায়।
(পাটাপুতা)
(শরীয়তপুর)

ল

৯০। লম্বা ব্যাডা হাবিব
গলা ভরা তার তাবিজ।
(শুপারী গাছ)
(মাদারীপুর)

৯১। লাল মিয়া আড়ে যায়
নিতা আড়ে থাবর খায়।
(মাটির পাতিল)
(শরিয়তপুর)

৯২। লতা নয় লতি নয়,
একে বেঁকে যায়।
সব অংগ ছেড়ে দিয়ে
চক্ষু দুইটি খায়।
(ধুয়া)
(শরীয়তপুর)

৯৩। শত পায়ে একে বেঁকে চলে সে জীবনটা
হাজার হাজার মানুষ খেয়েও ভরে না তার পেটটা।
(রেলগাড়ী)
(রাজবাড়ী)

৯৪। শিলুক শিলুক মহা শিলুক
শিলুকের মধ্যে পাও।
এই শিলুকের মানি যে ভাঙ্গতি না পারে
সে কেটি কুত্তার ছাও।
(জুতা)
(গোপালগঞ্জ)

Dhaka University Institutional Repository

৯৫। শালিকের তিন মাতা
নিত্যি খায় লতা পাতা
(চুলা)
(মাদারীপুর)

স

৯৬। সবুজ মিয়া আড়ে যায়
নিত্যি আড়ে চিমটি খায়।
(লাউ)
(শরীয়তপুর)

৯৭। সাত বাপ বেটার এক গুয়া ।
(রশুন)
(গোপালগঞ্জ)

৯৮।সোনার মত লতাটি
চিরল চিরল পাতাটি
পাকলে থোয় মজলে খায়।
(খেজুর)
(ফরিদপুর)

৯৯। সাদা বকরী সবুজ থাল
গোস্ত সাদা তার হাড্ডি লাল।
(তরমুজ)
(রাজবাড়ী)

১০০। সে যে এক রসিক চান
নাকে বসে ধরে কান
(চশমা)
(ফরিদপুর)

Dhaka University Institutional Repository

প্রবাদ

অ

১। অমাইনষের কতা না সয় গায়
মশার কামড় না সয় পায়।
(মাদারীপুর)

আ

২। আইল্যার[১] আল, জাইল্যার জাল,
(মাদারীপুর)

৩। আমনা হাসুরী[২] ছেলাম পায়না
মামী হাসুরী ডোয়া[৩] পায়।
(মাদারীপুর)

৪। আস্তে রান্ধে ধীরে খায়
জুড়াইলে সেনা মজা পায়।
(মাদারীপুর)

৫। আপন কথা পরের ধারে কয় যে তারে কয় পর
চৈত্র মাসে কাতা গায় দিলে তারে কয় জ্বর।
(মাদারীপুর)

৬। আমি কান্দি মায়ের লাগি
মায় কান্দে নাঙের লাগি।
(শরীয়তপুর)

৭। আমে দুদে মিশে এক হয়
আটি জঙ্গলে যায়।
(মাদারীপুর)

৮। আড্ডি বাঙ্গলি জোড়া লাগরি
কলে আর বলে।মন বাঙ্গলি
জোড়া না লাগবি ইহ জনমের কালে।
(ফরিদপুর)

---

১ আইল্যা - আইল > আইল্ল্যা > আইল্যা = চাষা ।

২ হাসুরী - শাশুড়ি > সাসুড়ি > সাসুরি > হাসুরী = স্বামীর মা ।

৩ ডোয়া - < ডোআ = ঘরের চারপাশের পিড়া ।

Dhaka University Institutional Repository

৯। আমের বছর বান
তেতুলির বছর ধান।

(রাজবাড়ী)

১০। আগের আল যেমনে যায়
পিছের আল তেমনি ধায়।

(ফরিদপুর)

১১।আপন থন পর বালো,
পরের থন জঙ্গল বালো ।

(মাদারীপুর)

১২।আমার বাড়ী আমার ঘর
আমারে দেয় ঢেকী ঘর ।

(গোপালগঞ্জ)

১৩।আউস আমন ভুষি
যার যেমন খুশি।

(গোপালগঞ্জ)

১৫।আমি যদি কই
গাঙে দিয়া চলে মই।

(গোপালগঞ্জ)

১৬।আমি হলাম গুড়ের বাবা
আমারে দেয় শুধা চিড়া।

(গোপালগঞ্জ)

উ

১৭। উঠান নাই তার ফুটানি
বাক্স নাই তার ছুড়ারি।

(ফরিদপুর)

১৮। উপশে চিনে ঝুইল্যা খ্যাত।
পৈক্ষে চিনে ডাল
মাছে চিনে গহীন জলা
কাকড়ায় চিনে খাল।

(ফরিদপুর)

Dhaka University Institutional Repository

এ

১৯। এক গোদাড়ে কয় কথা
আরেক গোদারে নাড়ে মাথা
আরেক গোদাড়ে কয় ঐ যে কয় আমার কথা।
(ফরিদপুর)

২০। এক পুতের মা রাজরানী
সাত পুতের মা কাঠ কুড়ানী।
(মাদারীপুর)

২১। এক চোখ কান যার
১৮-গুন বুদ্ধি তার।
(গোপালগঞ্জ)

২২। একেতো নাচুনি বুড়ী
তার উপর ঢোলের বাড়ী।
(মাদারীপুর)

২৩। এক পুত্রের আশ
নদীকুলে বাস
ভাবনা বার মাস।
(শরীয়তপুর)

২৪। একগাছের বাকল আরেক গাছে না লাগে
আডা দিয়া লাগাইলে চডা দিয়া উডে।
(মাদারীপুর)

ও

২৫। ওছে না পোছেনা নায়ের পাতা দিয়া
এত রাতে কান্দি কেন চোখে তেল দিয়া।
(ফরিদপুর)

২৬। ওরে আমার ছুচোরাম
কথায় তো পোড়ে চাম ।
(গোপালগঞ্জ)

২৭। ওরে আমার শেফালী
কত যে ঢক দেখালী।
(গোপালগঞ্জ)

Dhaka University Institutional Repository

ক

২৮। কানায় কয় বয়রায় হোনে
নিত্যি কতায় হয় হয় করে।

(গোপালগঞ্জ)

২৯। কেউ চুরি করে বেচে যায়
কেউ দেখতে গিয়ে সাজা পায়।

(মাদারীপুর)

৩০। কলায় দলা হলুদে ছাই
বউয়েরে সেবিলে পুতেরে পাই।

(শরীয়তপুর)

৩১। কথায় কথা বাড়ে
জলে বাড়ে ধান
বাপের বাড়ীতে থাকলে
মেয়ের হয় অপমান।

(রাজবাড়ী)

৩২। কবরে গেছে পাও
এহনো দেও মোছে তাও ।

(গোপালগঞ্জ)

খ

৩৩। খাওয়াইয়া আছে বার বাই
কামের বেলায় কেহ নাই।

(মাদারীপুর)

৩৪। খোড়া নিলো শিয়ালে
বুঝবানে বিয়ালে[১]।

(গোপালগঞ্জ)

৩৫। খোটা দেব্যার খোটা ন্যাই
খোটা দেব কি?
তোর মাউঠান ঠাপানির ঝি।

(ফরিদপুর)

---

[১] বিয়ালে - বৈকাল > বৈয়াল > বিয়াল + এ = বিয়ালে

Dhaka University Institutional Repository

গ

৩৬। গাই বাছুরে পিরীত থাকলি
আন্ধার রাইতে দুধ দেয়।

(ফরিদপুর)

৩৭। গাধায় বয় চিনির বোঝা
গুতয়ে হয় দুষ্ট সোজা।

(মাদারীপুর)

ঘ

৩৮। ঘরামীর[১] নাই ঘর
কবিরাজের বউর নিত্য জ্বর।

(মাদারীপুর)

৩৯। ঘরের ইন্দুরে কাটে বের
কেউ না পায় টের ।

(ফরিদপুর)

৪০। ঘরে নাই ঘটি বাটি
কোমরে মেলাই[২] চাবিকাঠি।

(গোপালগঞ্জ)

৪১। ঘোচে নাই যার কামের গন্ধ
ভাতার[৩] মরলে তার হয় আনন্দ ।

(মাদারীপুর)

৪২। ঘাড়ে পথের শালা
আর আবেজানও খালা।

(গোপালগঞ্জ)

চ

৪৩। চাইলের বিতর আহালি
কত রঙ্গ দেহালি।

(শরীয়তপুর)

৪৪। চোরে চোরে আলি
একচোরে বিয়া করে
আরেক চোরের হালি।

(ফরিদপুর)

---

[১] ঘরামী - ঘর + আমি > ঘরামী = ঘর নির্মানকারী মিস্ত্রি ।

[২] মেলাই - √মিলা > মেলা + আই = মেলাই ।

[৩] ভাতার - ভাত + অর = ভাতার = স্বামী ।

Dhaka University Institutional Repository

৪৫। চোরের মার বড় গলা
নিজে খায় দুধকলা।

(রাজবাড়ী)

ছ

৪৬। ছাগল মরে ত্যালে
মানুষ মরে ম্যালে।

(গোপালগঞ্জ)

৪৭। ছেলের দেহা নাই
আজামের হাতে দুস্তি ।

(মাদারীপুর)

৪৮। ছাল নাই কুত্তার বাগা নাম।

(মাদারীপুর)

৪৯। ছেলের আতে মোয়া দিলে
ময় মুরুব্বির মন মিলে ।

(মাদারীপুর)

জ

৫০। জাতায় বাঙ্গে ডাইল
লাঙ্গলে চেনে আইল।

(মাদারীপুর)

৫১। জানি কাম করিনা
নিদেন কালে মরিনা ।

(রাজবাড়ী)

৫২। জাতের মাইয়া কালাও বালো
নদীর জল ঘোলাও বালো।

(মাদারীপুর)

৫৩। জামাইর পাতে নাই বাত
আমার হোচনের কি আল্লাদ।

(গোপালগঞ্জ)

৫৪। জামাই দেইক্যো আড়ে
বউ দেইক্যো গাড়ে।

(শরীয়তপুর)

400412

Dhaka University Institutional Repository

ট

৫৬। টোপ গিলিলে মাছ বিধেনা
সেই বা কেমন বড়শী
ইশারায় কতা বুঝেনা
সেই বা কেমন পড়শী।

(ফরিদপুর)

ঢ

৫৭। ঢেকী কুল ক্ষয় যাক,সিথির সিন্দুর বজায় থাক।

(মাদারীপুর)

ত

৫৮। তিন দিনের মুসলমান
দাড়ি ধরে ঘরে আন।

(গোপালগঞ্জ)

৫৯। তেতুল গাছের বনপাতা
শাশুড়ী নন্দের এত কতা ।

(শরীয়তপুর)

দ

৬০। দধি দুগ্ধ করিয়া ভোগ
ঔষধ দিয়া খন্ডাব রোগ
বলে ডাক,এই সংসার
আপনি মইলে কিসের আর।

(মাদারীপুর)

৬১। দাতার বাড়ী কলা কচু
বকখিলের বাড়ী বাঁশ
ছাগল পালে পাগলে
গিদরে পালে আঁস।

(শরীয়তপুর)

Dhaka University Institutional Repository

৬২। দুধ নষ্ট কইর‍্যা দই
ধান নষ্ট কইর‍্যা খই।

(মাদারীপুর)

৬৩। দুধ নষ্ট গো চোনায়
পোলা নষ্ট আডে
বউ নষ্ট নায়েরে
ঝি নষ্ট গাডে।

(রাজবাড়ী)

৬৪। দশজন যেহানে আল্লাহ্ সেহানে।

(গোপালগঞ্জ)

৬৫। দুষ্ট লোকের মিষ্ট কতা ঘনাইয়া বসে কাছে
কতা দিয়া কতা নেয় প্রানে মারে শেষে।

(মাদারীপুর)

ধ

৬৬। ধরি মাছ না ছুইকাদা
তারে কয় শাহজাদা।

(গোপালগঞ্জ)

৬৭। ধান নাই চাল নাই উগির[১] ভরা ইন্দুর
টাকা নাই পয়সা নাই কপাল ভরা সিন্দুর।

(মাদারীপুর)

ন

৬৮। নতুন নতুন দিন দুই
চিতাই পিডা খান দুই।

(ফরিদপুর)

৬৯। নিতে পারি খেতে পারি
দিতে পারিনা
বইতে পারি কইতে পারি
সইতে পারি না।

(গোপালগঞ্জ)

---

[১] উগির = মাচা, ঘরের চাটাতন ।

Dhaka University Institutional Repository

৭০। নাড়ীশুগায় ভাতে
শ্রী আংটি হাতে ।

(মাদারীপুর)

৭১। নিজের হয়ে খাও
পরের হয়ে চাও ।

(রাজবাড়ী)

প

৭২। পরের জন্য কান্দে মন
পর কখনো হয়না আপন ।

(গোপালগঞ্জ)

৭৩। পর লাগেনা পরে
তেতুল লাগেনা জ্বরে।

(মাদারীপুর)

৭৪। পিঠারও চিটা আছে
বিলানো পিঠা জুদা আছে ।

(ফরিদপুর)

৭৫। পিঠা খায় মিঠার লোভে
যদি পিঠা মিঠা লাগে।

(শরীয়তপুর)

৭৬। পাছায় নাই লোম,
পুঁথি পড়ার জোম ।

(মাদারীপুর)

৭৭। পরের ধনে পোদ্দারী
মিয়ার বড় সর্দারী।

(মাদারীপুর)

৭৮। পাছায় নাই ছেড়া ত্যানা
মিডাই দিয়া বাত খায়না।

(মাদারীপুর)

৭৯। পরের পিডা,
বেজায় মিঠা।

(মাদারীপুর)

Dhaka University Institutional Repository

৮০। পুইয্যা মাইনাসির নাওয়া
ম্যায়া মাইনসির খাওয়া।
(রাজবাড়ী)

৮১।প্যাটে নাই বাত
খালি নাঙ্গের উৎপাত।
(শরীয়তপুর)

ফ

৮২। ফুলের মইধ্যে ধুতরা
কুটম্বের[১] মইধ্যে পুতরা।
(মাদারীপুর)

৮৩। ফল খাইয়া যে খায় জল
সে যায় রসাতল।
(ফরিদপুর)

ব

৮৪। বাড়ীর কাছে পাইয়া
কুত্তা আসে ধাইয়া।
(গোপালগঞ্জ)

৮৫। বাড়ী তোমার হুগলী
তাইতো কথার এত বুগলি।
(শরীয়তপুর)

৮৬। বাপে পড়ে ছেড়া জামা
পোলায় করে বাবুয়ানা।
(মাদারীপুর)

৮৭। বাপ রাজায় হব রাজার ঝি
বাই রাজায় আমার তাতে কি?
স্বামী রাজায় হব রাজরানী।
(গোপালগঞ্জ)

৮৮। বাড়ীর দরজার খাস
আপনা গরুতে খায়না।
(শরীয়তপুর)

---

[১] কুটুম্ব > কুটুম্বু > কুটুম = অতিথি ।

Dhaka University Institutional Repository

৮৯। বাঘে মহিশে যুদ্ধ বাধায়।
নল খাগড়ায় পরান যায়।

(ফরিদপুর)

ভ

৯০। ভাত ছিড়াইলে কাউয়ার অভাব হয় না ।

(মাদারীপুর)

৯১। ভাত খায় ভাতারের, □
গীত গায় নাঙ্গের।

(রাজবাড়ী)

৯২। ভাত খাইলে হয় ভাতারের মন
পান খাইলে হয় নাঙ্গের মন।

(ফরিদপুর)

য

৯৩। যার লাইগ্যা করি চুরি
সেই করে সিনাজুরি[১] ।

(মাদারীপুর)

৯৪। যদি হয় সুজন এক বিছনায় শোয় নয় জন
যদি হয় কুজন নয় বিছানায় শোয় নয় জন ।

(শরীয়তপুর)

৯৫। যার যা কামনা জোলায় বেচে তেল।

(গোপালগঞ্জ)

৯৬। যেমন মাইয়া মাঠ মারানী
তেমন জামাই ছদু ঘরামী।

(গোপালগঞ্জ)

৯৭। যেমন হাড়ি তেমনি সরা
যেমন সাজ তেমন পিঠা ।

(রাজবাড়ী)

৯৮। যার লাইগ্যা যার মজে মন
কিবা হাড়ি কিবা ডোম ।

(গোপালগঞ্জ)

---

[১] সিনাজুরি - সিনা - জোর + ষ্ণু = সিনাজুরি

Dhaka University Institutional Repository

৯৯। যেমন মা তেমন ঝি
তেমনি তার নাতি নটি।

(মাদারীপুর)

১০০। যার মনে যা ফালদে ওঠে না তা ।

(রাজবাড়ী)

১০১। যেমন তেরী কাটা
তেমন ধেরী কাটা ।

(মাদারীপুর)

১০২।যে করে পাপ সে হয় আঠার ছাওয়ালের বাপ
যে করে পুণ্যি তার ঘর হয় শুন্যি।

(শরীয়তপুর)

১০৩।যারে দেহি নাই সে বড় সুন্দরী
যার রাধা খাইনি সে বড় রান্দনী।

(ফরিদপুর)

ম

১০৪। মা গুনে ঝি
ভাত গুনে ঘি ।

(মাদারীপুর)

১০৫। ম্যাড়া কোদে খুটার জোরে
মানীর মান আল্লায় রাখে।

(মাদারীপুর)

১০৬। মোডে মার রান্দে না
তার উপর পান্তা ।

(গোপালগঞ্জ)

১০৭। মায়ের প্যাটের ভাই
কোথায় গেলে প্যাই।

(শরীয়তপুর)

১০৮। ময়না মাসিলো
ওতোর পান্তা বাতে ঘি
পেডের ছেলে হলো রাজা
আমি হলাম কি?

(গোপালগঞ্জ)

Dhaka University Institutional Repository

১০৯। মার নাম চুটকি বান্দি
ছেলের নাম সুলতান শাহ।
(ফরিদপুর)

১১০। মাছ থাকলে পেডা আছে
মানুষ থাকলে খোডা আছে।
(গোপালগঞ্জ)

১১১। মিয়া বিবি রাজি
করবে ডা কি কাজি ?
(গোপালগঞ্জ)

১১২। মাল যায় যার
ঈমান যায় তার।
(মাদারীপুর)

১১৩।মানুষ বুঝে কইও কতা
দেবতা বুঝে নোয়াই ও মাতা।
(শরীয়তপুর)

১১৪।মজা মারে ফজা বাই
আমা:। বইয়া গুম কামাই।
(মাদারীপুর)

শ

১১৫। শুভ ক্ষন দেখে কর যাত্রা
পথে যেন না হয় অশুব বার্তা ।
(মাদারীপুর)

১১৬। শোয় ছালার চটে
ছবি আঁকে চিত্র পটে।
(গোপালগঞ্জ)

স

১১৭। সুন্দর মানুষ খাসির ছাই।
ভিতরে কোন পদার্থ নাই।
(গোপালগঞ্জ)

১১৮। সকালের মুঠি
সারাদিনের খুটি
(শরীয়তপুর)

১১৯। সাজলে গোছলে বেডী
ল্যাপলে পোছলে মাডি ।
(শরীয়তপুর)

১২০। সৎ সতালুর ঘর
আল্লায় রক্ষা কর ।
(মাদারীপুর)

১২১। সুজনের গাড়া কুজনে খোড়ে ।
যার যার গাড়ায় তে তে পড়ে ।
(রাজবাড়ী)

Dhaka University Institutional Repository

১

দূরের চাকরীতে বন্ধু যাইও নারে,
দূরের চাকরীতে বন্ধু যাইও নারে।
আরো ৬ মাস খাওয়াইমু তোমারে,
নাকের ডাসা বিক্রি করিয়া রে।
দূরের চাকরীতে বন্ধু যাইও নারে।
নাকের ডাসা বিক্রি করলে
শাশুড়ী মন্দ বলবেরে ।
দূরের চাকরীতে বন্ধু না যাইও রে,
বর্ষার ৬ মাস খাওয়াইমু তোমারে।
বর্ষার ৬ মাস খাওয়াইমু তোমারে,
গলার হারও বিক্রি করিয়ারে ।
দূরের চাকরীতে বন্ধু না যাইও রে।
গলার হারও বিক্রি না করলে,
গলার হারও বিক্রি না করলে।
শাশুড়ী মন্দ বলবেরে।
দূরের চাকরীতে বন্ধু যাইও নারে।

(মাদারীপুর)

২

হলুদ বাটো মেন্দী বাটো,
ও ময়না বাটো জলদি কইর‍্যারে
হলুদ বাটো মেন্দী বাটোরে ।
ও গুণের ময়না বাটো জলদি কইর‍্যারে।
তোমার শ্বশুর আব্বায় আইলে
ও ময়না হাজার ছালাম দিবারে ।
হলুদ বাটো মেন্দী বাটোরে
ও ময়না বাটো জলদি কইর‍্যারে ।
তোমার শাশুড়ী আম্মায় আইলে
ও ময়না ওজুর পানি দিবারে,
হলুদ বাটো মেন্দী বাটোরে
ও ময়না বাটো জলদি কইর‍্যারে ।
তোমার ভাসুরে আইলে
ও ময়না ফুল বিছানা লাছবারে।

(শরীয়তপুর)

৩

কলসী ভরিতে গেলাম সাগর দিঘীর পারে,
কলসী ভরিতে গেলাম সাগর দিঘীর পারে।
সুন্দর দেখিয়ারে জনায় লইয়া যায় মোরে,
রূপ ও না দেখিয়া লইয়া যায় মোরে।

Dhaka University Institutional Repository

কইও কইও কইওনা খবর শাশুড়ী আম্মার কাছে,
সুন্দর দেখিয়ারে জনায় লইয়া যায় মোরে।
রূপ ও দেখিয়া লইয়া যায় মোরে,
কলসী বোড়াইতে গেলাম সাগর দিঘীর পারে।
সুন্দর দেখিয়া লইয়া যায় মোরে।
কইও কইও কইওনা খবর শ্বশুর আব্বার কাছে,
সুন্দর দেখিয়া লইয়া যায় মোরে।
রূপ ও না দেখিয়া লইয়া যায় মোরে,
(মাদারীপুর)

৪

বাপের বাড়ীর দালান কোঠা না হইয়াছেরে আপন
পরের বাড়ীর খেরের ঘরওরে হইয়াছে আপন।
আমি কার বা নাইওরও আসিরে।
কইও কইও খবর কইও আমার বাবাজানের কাছে
আমি কারবা নাইওর আসিরে।
বাপের বাড়ীর লেপ তোষকরে না হইয়াছে আপন
পরের বাড়ীর দোতরা[১] খাতারে হইয়াছে আপন ।
এই ছিল আমার কপালেরে
কইও কইও খবর আমার মা জননীর কাছে।
আমি কারবা নাইওর ও আসিরে
বাপের বাড়ীর খাট ও পালংরে না হইয়াছে আপন।
পরের বাড়ীর মাটি ও সপের বিছানা হইয়াছে আপন।
উইরা যাওরে পশু পংঙ্খী উইরা যাওরে
কইও কইও খবর আমার ভাইজানেরও কাছে
আমি কারবা নাইওর আসিরে।
(গোপালগঞ্জ)

৫

হলদির দ্যাশে নারে যাইও দুলাল,
হলদির রং ও লাগিবে গায়েও দুলাল।
বাবা জানতো শুনলে উল গাইয়া ফেলবে
হলদির ও গাছ।
মেনদির দ্যাশে নারে যাইও দুলাল,
চাচা জানতো শুনলে উল গাইয়া ফেলবে

Dhaka University Institutional Repository

মেনদির গাছ।
মেতির দ্যাশে নারে যাইও দুলাল,
মেতির ঘ্রাণ লাগবে গায়েও দুলাল।
মিঞা বাইতো শুনলে উল গাইয়া ফেলবে
মেতির গাছও।
গিলার দ্যাশে নারে যাইও দুলাল,
গিলার রং ও লাগবে গায়েও রে দুলাল।
মামা জানতো শুনলে উল গাইয়া ফেলবে
গিলারও গাছ।
হুন্দার দ্যাশে নারে যাইওরে দুলাল,
হুন্দার রং ও লাগবে গায়েও দুলাল।
দুলাবাইতো শুনলে হারে দুলাল,
উল গাইয়া ফেলবে হুন্দার ও গাছ।

(ফরিদপুর)

৬

নারী ঃ আড়িয়াল খাঁর ভাঙ্গলকূলে ধর বানাইলে বন্ধুরে
ভাইস্যা যাইব বাইষ্যা কাল আইলে
পু ঃ ডরাইওনা সোনার বন্ধু ঘর বাড়ি ভাইস্যা গেলে
বানাইমু আবার শীত কালে।
পু ঃ আমি কাটুমু ভিটার মাটি তুমি বানবা পিড়া
নারী ঃ তুমি দিবা চালের ছাউনি আমি বান্ধুম বেড়া
উভয় ঃ (নতুন চরে নতুন ঘরে) ২ থাকুম দুইজন মিলে
পু ঃ নানা জাতের গাছ-গাছালি লাগাইমু বাড়িতে
নারী ঃ দেখতে দেখতে বড় হইয়া যাইব দিনে রাইতে
পু ঃ ফলব কত ফল ফলাদি সব্জী ও তরকারী
নারী ঃ সারা বছর খাইমু আর বিলাইমু পরশী বাড়ি
উভয় ঃ (আইব কোলে সোনার চান এক) ২দয়াল আল্লায় দিলে

৭

সাথীরা ঃ হেইয়া হো হেইয়া .....(৩বার)
ওরে ও.....মাঝি হে
হেই সালাম সালাম মাঝি সালাম

Dhaka University Institutional Repository

তুমি শক্ত করিয়া ধর হাল
দেখ উত্তর আকাশ ছাইয়া, বিজুলি চমকাইয়া
কাল বৈশাখী আসে ধাইয়া
বুঝি জগৎটা ফালাইবো খাইয়া
তাই সাথীরা ভয়ে বিহ্বল।

মাঝি ঃ ওরে ও ..... সাথী হে
দেখ ঝড়-বাতাসের সঙ্গে
উঠেছে তুফান গাঙ্গে
তারে কইরা উথাল পাথাল
তোরা খুইলা দড়াদড়ি, কইরা ধরাধরি
তাড়াতাড়ি গুটাও পাল
দাও জোরে টান দাঁড়ে, দেখ কাছে ধারে
আছে কিনা কোন খাল।

সাথীরা ঃ হায় আল্লাহ! ও আল্লাহ, এখন কি হইব
গরীবের নাও মোরা কেমনে বাঁচাইব,
কেমনে বাঁচাইব এই জানমাল

মাঝি ঃ ও তোরা ডরাইসনা কান্দিসনা, নাই ওরে ভয় নাই
এই গরীবের আল্লাহ সার তারে ডাক সবাই
আল্লায় বাঁচাইব এই গরীব ও কাঙ্গাল-
তোরা মুখে আল্লাহ রছুল-বল
তোরা মুখে আল্লাহ রছুল বল।

(মাদারীপুর)

৮

নারী ঃ আয়রে কুমার
আয়রে আমার প্রাণের কুমার আয়রে মাটি লইয়া
বানাই মোরা হাড়ি কলসি যায়রে বেলা বইয়া।

পু ঃ (আয় কুমারী আমার সাথে, ছাইনা মাটি নরম হাতে)২
বানাইয়া খেলনা পুতুল দিবি রঙ লাগাইয়া

নারী ঃ মৌসুমী মেলায় যাইয়া
নগদ দামে বেইচা দিয়া
আমার লাইগা মালা চুড়ি আনবি তুই কিনিয়া।

পু ঃ আয় কুমারী

Dhaka University Institutional Repository

আয়রে আমার প্রাণ কুমারী আয়রে বানাই মোরা
ফুলের টব আর টালি সোরাই লোটা বাসন খোরা
নারী ঃ (রৌদে তারে শুকাইয়া
সারি সারি সাজাইয়া)২
পাকা পোক্ত করি পুইনের আগুনে পোড়াইয়া
পু ঃ বিকাল বেলা হাটে যাইয়া
নগদ দামে বেইচা দিয়া
তোর লাগিয়া ঢাকাই শাড়ি আনিব কিনিয়া, আয় কুমারী
নারী ঃ আয়রে কুমার, আয়রে প্রাণেরে কুমার আয়রে মাটি লইয়া
বানাই মোরা হাড়ি কলসি যায়রে বেলা বইয়া
পু ঃ আয় কুমারী
নারী ঃ আয়রে কুমার
পু ঃ আয়রে কুমারী
নারী ঃ আয়রে কুমার।

(ফরিদপুর)

৯

সমবেত ঃ মোরা সান্দার বাইদার দল, শুধু নাওখানি সম্বল
বড়শী বাইয়া জাল ফালাইয়া ধরি মাছ পোনা কেবল ।
পু ঃ মোগ বউ করে গাঁওয়াল - লইয়া কাংখে এক ছায়োল
(বেঁচে চুড়ি, আলতা, ফিতা)২ঝুনঝুনি আর মল
নারী ঃ মোগ ছুইটকা পোলা মাইয়া দুইডা পানতা ভাত খাইয়া
ডুবাডুবি কইরা ঘোলা করে গাঙ্গের জল
পু ঃ মোগ ডাঙ্গর মাইয়াডায় বইঠা টানে পায়ে পায়
(মাছ ধরিয়া বেইচা মোরা) ২ কিনি ডাইল আর চাউল ।
নারী ঃ মোগ জুয়ান ছাওলরা বেড়ায় ঘুা ফিরা
ফাঁন পাতিয়া পংখী ধরে সারাদিন কেবল
পু ঃ গাঙ্গে ইঠলে ঝড় তুফান ডরে কান্দে পোলাপান
(গর বাড়ি নাই উঠব কোথায়)২ বল ভাই সকল।

(গোপালগঞ্জ)

Dhaka University Institutional Repository

১০

আইজ কন্যা যাইব শশুর বাড়ি
আাইজ কন্যা যাইব জামাই বাড়ি
আইস কন্যার মাসি পিসি আইস পাড়াপরশী
কন্যারে সাজাইয়া দাও তোমরা সবাই বসি
বিয়ার নাচন নাচে খে ছুড়ির সাথে বুড়ি।
জামাই আনছে গয়না সাজানিও কত
কন্যারে সাজাইয়া দাও তোমরা মনের মত
দেইখা যেন ভাবে জামাই মানুষ নয় হুর পরী।
নাকে পরাও নোলক কানে পরাও কান পাশা
এত দিনে পূর্ণ হইল সবার মনের আসা
গলায় পরাও হাসুলি আর হাতে সোনার চুড়ি।
জামাই বাড়ি দেখতে কন্যায় আইব কত নারী
রূপ দেইখা তার মরবে সবাই হিংসায় জ্বইলা পুড়ি
নোনদেরা আক্ষেপে বলবে সইতে না পারি।

(ফরিদপুর)

১১

ভাবী ও ননদ ঃ ও ধান ভানি রে ঢেকিতে পার দিয়া
ঢেকি নাচে আমি নাচি হেলিয়া দুলিয়া ---- ও ধান ভানিরে
ননদ ঃ ধান ভানিতে ভানিতে আইজ রাইত হইয়াছে মেলা
ঘরের মধ্যে মনের মানুষ ঘুমাইছে একেলা রে ঘুমাইছে একেলা
(এপাশ ওপাশ করে সে যে)২ গোস্বাতে ফুলিয়া----ও ধান ভানি রে
ভাবী ঃ ও ননদী ক্ষেপিস নারে একটু সবুর কর
মিষ্টি পানের খিলি খাওয়াই ভুলইমু তোর বর রে ভুলাইমু তোর বর
রসের পিঠা রাইখা দিছি ছিকাতে ঝুলাইয়া---ও ধান ভানি রে।
ভাবী ও ননদ ঃ ও রে দাদী লোডের গোড়ায় ঝিমাও কেন বইয়া
হাত চালাইয়া দাও রে তুমি খোলা আউলাইয়া
চাউল কাড়াইয়া যাইমু ঘরে কলসে তুলিয়া---ও ধান ভানি রে।

(রাজবাড়ী)

Dhaka University Institutional Repository

সারীগান

১২

তালে তালে ফ্যালাও বৈঠা নদীর উজান
আল্লা আল্লা বল সবে ঘন মারো টান।
নৌকার বুকে বাজে পানি,
ঢেউতে করে হানাহানি,
জোরে মারো টান ।
বাইয়্যা চলো মাঝি মাল্লা
মুখে বলো আল্লা আল্লা
সবাই মারো টান।

(ফরিদপুর)

মুর্শিদা গান

১৩

দয়াল চাঁন বাণিজ্যেতে যায়
সোনার খড়ম রাঙ্গা পায়,
দয়াল চাঁন বাণিজ্যেতে যায়।
বনের বাঘে বৈঠা খায়
পানির কুম্ভীরে টানে গুণরে ।
বৈদেশী নাইয়া
আজ আমি জোয়ার পাইয়া
কোন বা দ্যাশে[১] চইল্যাছি বাইয়া
দয়াল চাঁন বাণিজ্যেতে যায়।
বালির চরে রাইন্ধ্যা খায়
জোরে ভাসাইয়া নিল হারে
বৈদেশী নাইয়া
আজ আমি জোয়ার পাইয়া,
কোন বা দ্যাশে যাই,
দয়াল চাঁন বাণিজ্যেতে যায়।
সোনার খড়ম রাঙ্গা পায়
দয়াল চাঁন বাণিজ্যেতে যায়।

(ফরিদপুর)

Dhaka University Institutional Repository

ফরিদপুরের আনুষ্ঠানিক গীত

১৪

স্ত্রী ঃ ভাত কড় কড়, ব্যান্নুন হল বাসি, ভাইধন আইছেরে নিবার রে, সাধুরে আমার নায়ার যাবার দাও।

স্বামী ঃ তুমি কবে নায়ারে ফুল মালা আমার ভাত রাধবে কেডা, তুমি কবে নায়ারেরে ফুলমালা, আমার পান বানাবি কেডা।

স্ত্রী ঃ ছয় মাসের ভাতরে সাধু আমি ছয় দন্ডে রাঁধব। ছয় মাসের পানরে সাধু আমি একদন্ডোই দেব।

স্বামী ঃ তুমি যাবে নায়ারে রে ফুলমালা, আমার বিছানা দিবে কেডা। ছয় মাসের বিছানা রে সাধু এক দন্ডেই দেব। তুমি নায়ারে গেলেরে, ফুল মালা আমার কথা কইবে কেডা। ছয় মাসের কথারে সাধু আমি এক দন্ডেই কব।

(ফরিদপুর)

১৫

ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা চলকে ওটে পানি।
ধীরে ধীরে বাও রে মাঝি ভাই মায়ের কান্দা শুনিরে।
ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা চলকে ওঠে পানি।
ধীরে বাও রে মাঝি ভাই, ভাইয়ের কান্দা শুনি।
ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা চলকে ওঠে পানি।
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি ভাই, বুইনের কান্দা শুনি।

(ফরিদপুর)

প্রেমগীত

১৬

আঁচলে বাঁধছে সর্বদায় সে আমায়,
কেমন করে তার ভালবাসা পাসরিব।
সে যে রূপেরি রূপ আমি কেমান মনে ভুলে রব।
অন্তরে বাঁধছে সর্বদায় সে আমায়,
কেমন করে তার ভালবাসা পাসরিব।
সে যে মধুর কথা, আমার হৃদয়ে রয়েছে গাঁথা।
আমি কেমন করে তোমার ভুলে না দেখে প্রাণ ধরে রব।

(রাজবাড়ী)

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

আব্দুল খালেক, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক উপাদান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

আব্দুল হাফিজ, লোককাহিনীর দিক-দিগন্ত, আইডিয়াল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, রাজশাহী, ১৯৭৯

আবু তালেব মিয়া, বৃহত্তর ফরিদপুরের লোকসাহিত্য ও খ্যাতিমানদের ইতিবৃত্ত, পল্লী বাংলা কবি সাহিত্যিক পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯০

আশরাফ সিদ্দিকী, লোকসাহিত্য, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৩

আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা লোকসাহিত্য, ১ম খন্ড ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬২
আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা লোকসাহিত্য, ২য় খন্ড ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬৩

ওয়াকিল আহমদ, বাংলা লোকসাহিত্য ছড়া, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮
ওয়াকিল আহমদ, বাংলা লোকসাহিত্য ধাঁধা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫
ওয়াকিল আহমদ, বাংলা লোকসাহিত্য প্রবাদ- প্রবচন, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪

কাজী দীন মোহাম্মদ, বাংলা লোকসাহিত্য ধাঁধা ও প্রবাদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮

খালেদ মাসুকে রসুল, নোয়াখালীর লোকসাহিত্যে লোক জীবনের পরিচয়, বাংলা একডেমী, ঢাকা, ১৯৯২

নিমলেন্দু ভৌমিক, বাংলা ছড়ার ভূমিকা, কলিকাতা, ১৯৯৮

মাযহারুল ইসলাম, ফোকলোর পরিচিতি ও লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

মাসুদ রেজা, ফরিদপুরের লোকসাহিত্য, ফরিদপুর শিল্পকলা পরিষদ, ১৯৮৩

Dhaka University Institutional Repository

সিরাজুদ্দিন কাসিমপুরী, বাংলাদেশের লোক সংগীত পরিচিতি, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩

হানিফ পাঠান, বাংলা প্রবাদ পরিচিতি, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬

Mazharul Islam,The Theoritical study of Folk Lore, Bangla Academy, Dhaka, 1998

Nurul Islam Khan, Bangladesh District Gazetteers, Faridpur.

পত্র-পত্রিকা

মুহম্মদ আব্দুল জলিল 'বাংলাদেশের লোক সংগীত ঃ ভাটিয়ালি ও ভাওয়াইয়া' লোক সংস্কৃতি পত্রিকা, রাজশাহী, শ্রাবণ-পৌষ, ১৪০২

মুস্তফা জামান আব্বাসী 'লোক সংগীতের বিষয় বৈচিত্র্য' লৌকিক বাংলা, জুন, ১৯৯৭

ওয়াকিল আহমদ, বাংলা লোকসাহিত্য ; শতাব্দীর সাধনা, সাহিত্য পত্রিকা, কার্তিক, ১৪০১